পরিণয়-কাহিনী

"Here are a few of the unpleasant'st words
That ever blotted paper".

Shakespeare

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩১০ সন

কলিকাতা

চেরিপ্রেসে

শ্রীতুলসী চরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিদ্যোৎসাহী, স্বদেশহিতৈষী,

দীন-প্রতিপালক

শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ রায় চৌধুরী

ভূম্যধিকারী মহোদয়কে

এই পুস্তক উপহার

প্রদত্ত হইল।

বিজ্ঞাপন

যে উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইল, তাহা এস্থানে বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। হিন্দুর বহুবিধ সংস্কারের মধ্যে বিবাহ একটী প্রধান সংস্কার। প্রকৃত হিন্দুহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রই বর্ত্তমান কালে সেই অতি প্রধান সংস্কারের শোচনীয় ব্যভিচার দর্শনে নিতান্ত ব্যথিতহৃদয় হইয়া থাকেন। দেশাচার শাস্ত্রের আসন অধিকার করিতেছে; হিন্দুসমাজও দিন দিন অধঃপতিত হইতেছে।

শ্রুতপ্রকৃত ঘটনার ছায়া অবলম্বন করিয়া আখ্যায়িকা কয়েকটী লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার কাব্যের নিয়ম অনুসরণ করিয়া তাহাতে অলঙ্কার সমাবেশ করিয়াছেন মাত্র।

প্রথম সন্নিবিষ্ট আখ্যায়িকা তিনটী কয়েক বৎসর গত হইল কলিকাতার একখানি প্রধান সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন

প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত 'স্থদ দ্যায় কে' গল্পটী এবার পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'শাপে বর' এবং 'মৃণালিণীর দৌত্য' আখ্যায়িকা দুইটী এবার নূতন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে গ্রন্থকারের নাম প্রকাশিত হইয়াছিল না, এবার তাহা প্রকাশ করা গেল।

১৩১০ সন। প্রকাশক

সূচিপত্র

"মা, তুমি কেঁদ না"

"*Jul.* Is there no pity sitting in the clouds,
That sees into the bottom of my grief?"

Romeo and Juliet

"Crabbed age and youth cannot live together".

The Passionate Pilgrim

"যঃ কন্যা পালনং কৃত্বা করোতি বিক্রয়ং যদি।
বিপদা ধনলোভেন কুম্ভীপাকং স গচ্ছতি ॥
কন্যা মূত্রপুরীষঞ্চ তত্র ভক্ষতি পাতকী।
কৃমিভির্দ্দংশিতা কাকৈর্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ ॥
মৃতশ্চ ব্যাধযোনৌ চ স লভেজ্জন্ম নিশ্চিতং।
বিক্রীনীতে মাংসভারং বহত্যেব দিবানিশিং ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ; প্রকৃতি খণ্ড

"শুল্কেন কন্যাং দাতৃংশ্চ পুত্রং ষণ্ডে প্রযচ্ছতঃ।
দেশান্নির্ব্বাসয়েদ্রাজা পতিতাম্ দুষ্কৃতাত্মনঃ ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ; ১১—৮৪

"মা, তুমি কেঁদ না"

"ঠাকুর, কমলার কোন্ সম্বন্ধ স্থির হইল?"

"কেন, এই যে সে দিন বিষ্ণুপুর হইতে ঘটক আসিয়া যে সম্বন্ধ উপস্থিত করিয়াছিল, সেই কার্য্যই তো স্থির করিয়াছি।"

"শুনিয়াছি, সে পাত্র নাকি ভারি বুড়ো?"

"বুড়ো—তা—বেশি কি? পঞ্চাশের কিছু উপরে হইতে পারে।"

"পঞ্চাশের কিছু উপরে! সে কি কম? শুনিয়াছি, তাহার চুল দাড়ি পাকিয়াছে; দাঁত পড়িয়া গিয়াছে। আমার সোণার প্রতিমা কমলকে এমন পাত্রে দিবে?"

"ওগো, মেয়ে মানুষে কি এ সকল কথা বুঝিতে পারে? সুবিধা কেমন! টাকা কতটা, তা একবার দেখ না? বার শত কোম্পানির টাকা, তা ছাড়া চারি বিঘা ভাল জমি! এ সম্বন্ধও ছাড়িতে আছে?"

"আচ্ছা, রাজনগরের ঘটকও তো অনেক টাকা দিতে চাহিয়াছিল; সে পাত্রটী বয়সেও কম, লেখাপড়াও শিখিয়াছে; গ্রামের সকলেই সেই কার্য্য করিতে বলিয়াছিল; সেটি করিলে না কেন?"

"গ্রামের লোকের তো অন্য কাজ নাই; পরামর্শ দিতে সকলেই পারে। রামচরণ ভট্টাচার্য্য তার নয় বছরের কালো মেয়ে দিয়ে নয়

শত টাকা পাইল; আর আমি এই ষোল সতের বছর খাওয়াইয়া পরাইয়া মেয়ে মানুষ করিয়াছি; এই মেয়ে আমি নয় শত টাকায় দি; তোমার বেশ বিবেচনা দেখিতেছি!”

ব্রাহ্মণী কোন উত্তর দিলেন না। ষোল সতের বৎসর পর্য্যন্ত মেয়েকে খাওয়াইয়া পরাইয়া মানুষ করিয়া, অবশেষে সেই মেয়ের গলায় কলসী বান্ধিয়া জলে দিবার সঙ্কল্প স্থির হইয়াছে দেখিয়া—স্ত্রীলোকের হৃদয়—ব্রাহ্মণীর চক্ষু হইতে টস্ টস্ জল পড়িতে লাগিল। ঠাকুর সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

অন্তরালে একটী ষোড়শী কুমারী দাঁড়াইয়াছিল। নবীন বয়স, প্রশান্ত দৃষ্টি, অনিন্দ্যকান্তি; তাহার লাবণ্যের ছটায় সেই পাপ পুরী আলোকিত হইয়াছিল। পিতামাতার গোপন আলাপ যে সন্তানের শ্রোতব্য নহে, কমল তাহা জানিত; কিন্তু নিজ সম্বন্ধে আলাপ, শুনিবার জন্য অভাগিনীর কৌতূহল হইল। শুনিতে শুনিতে হৃদয়ের আবেগে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত, অবশেষে সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। শেষে অভাগিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল:—“ভগবান যদি ইহাই করেন, হইবে। বাবা টাকা চান, তিনি টাকা পাইবেন; আমি তাহাতে বাধা দিব না। মা, তুমি কেঁদ না; আমার কপালে যা থাকে, হইবে।”

বিষ্ণুপুরের রামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ক্রমে ক্রমে চারি বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু একে একে চারি স্ত্রীরই মৃত্যু হইয়াছে। তিনি এখন পঞ্চমবার বিবাহের জন্য ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ইচ্ছা—পাত্রীটী বয়স্থা হয়, সুন্দরীও হয়। টাকার অভাব নাই; কিন্তু বয়সের গতিকে ভাল পাত্রী শীঘ্র জুটিয়া উঠিল না। বিশেষতঃ জনরব ছিল যে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চারি স্ত্রীই অনেক

কষ্ট ও যন্ত্রণা পাইয়া মরিয়াছেন। সে যাহা হউক, ঠাকুরের কপাল ভাল কমলার সঙ্গে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল।

বৈশাখের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে বিবাহের শুভ দিন স্থির হইয়াছিল। বর উপস্থিত। সকলে বর দেখিতে আসিল; দেখিয়া আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই ব্রাহ্মণকে গালি দিতে লাগিল। একটা মুখরা স্ত্রীলোক ছিল, সে বলিল :—"আজ চক্রবর্ত্তীবাড়ীতে বৃষোৎসর্গ।"

সেই দিন অপরাহ্নে কমলা খিড়কির বাগানে বেড়াইতেছিল। এখনও তাহার বিবাহের বেশ রচনা হয় নাই। শরতের নবীন মেঘের ন্যায় তাহার অবেণীসম্বদ্ধ নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি সুরভি বায়ুতে দুলিতে-ছিল। কোথায় সেই সুরভি বায়ু? অভাগিনীর ললাট, কপোল ভাসাইয়া ঘর্ম্ম পড়িতেছিল। অশ্রু ছিল কি? না, চক্ষু ভয়ানক শান্ত। ছোট ভাই প্রবোধ আসিয়া বলিল ;—"দিদি, বর দেখ্‌বি?—এই যে দেখা যায়।" কমলা উত্তর দিল না; কিন্তু প্রবোধের নির্দ্দিষ্ট পথে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল ;—পুকুরের ঘাটে, পক্কশ্মশ্রু, বিগতদশন, গলিতদেহ, বাহাত্তরোত্তীর্ণ বর সন্ধ্যা করিতেছেন, আর পাড়ার অনেক লোকে বরের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কমলা সেখান হইতে চলিয়া গেল। তাহার চক্ষু ভয়ানক শান্ত।

সন্ধ্যাকালে প্রতিবেশিনীরা মিলিয়া কমলাকে সাজাইল। পিতৃদত্ত সামান্য অলঙ্কার, ভাবীস্বামীদত্ত মূল্যবান অলঙ্কারে, পুষ্পালঙ্কারে প্রতি-বেশিনীরা কমলাকে সাজাইল। সজ্জা সমাপ্ত হইলে কমলাকে আর মানুষী বলিয়া বোধ হইল না; যেন কোন দেব কন্যা মর্ত্ত্যে আসিয়া-ছেন। কমলার পিতা বিবাহের পূর্ব্বে কমলাকে একবার দেখিতে আসিলেন। তাহার চক্ষুর অস্বাভাবিক শান্ত দৃষ্টি দেখিয়া ব্রাহ্মণ শিহরিয়া উঠিলেন। কমলার মাতা কমলাকে এক নিভৃত কক্ষে লইয়া গেলেন;

সেখানে তিনি কমলার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন সেই মঙ্গলের দিনে মায়ে-ঝিয়ে পরস্পরের গলা ধরিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে মনের আবেগে কমলার মুখ ফুটিল, বলিল ;—"মা, তুমি কেঁদ না। আমার কপাল ভাল ; বাবা তো আর কষ্ট পাইবেন না।"

আবার দুই জনে কাঁদিতে লাগিলেন।

নির্দ্দিষ্ট লগ্নে বিবাহকার্য্য শেষ হইল। বলিবার যোগ্য আর কিছুই তখন ঘটিয়াছিল না। কেবল বর কন্যার শুভদৃষ্টির সময় সেই বৃদ্ধ নির্লজ্জ চোখে চস্‌মা পরিয়া পাত্রীর দিকে শুভদৃষ্টি করিয়াছিল। কমলা বিবাহ মণ্ডপে প্রবেশ করিয়াই চক্ষু নিমীলিত করিয়াছিল : সে আর চাহিল না। বর কন্যা বাসর ঘরে প্রবেশ করিল। অনেক রাত্রিতে বিবাহের গোলযোগ মিটিয়া গেল ; লোক জন সকলেই নিদ্রা গেল। চারি বিঘা জমি এবং নগদ বার শত টাকা পাইয়া কমলার পিতার সুনিদ্রা হইল কি না, পাঠক তাহা অবধারণ করুন।

এ আবার কিসের গোলযোগ ; কিসের কান্না?--বাসরঘরে মহা গণ্ডগোল। অনেক স্ত্রীলোক পুরুষ তথায় প্রবেশ করিয়াছে। কমলার আসন্ন কাল উপস্থিত। তাহার চক্ষু—কপালে উঠিয়াছে : কষ্টে নিশ্বাস বহিতেছে, হস্তপদে খিল ধরিয়া আসিতেছে—তাহার বাক্‌রোধ হইয়াছে। কমলা পিতার কৌটা হইতে আফিঙ্গ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল ; বাস..র প্রবেশের সময় তাহা খাইয়াছে, মৃত্যু নিকট। তখন সেই হতভাগ্য পিতা চীৎকার করতঃ, শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন ;—"পিশাচ আমি, কেন এ সম্বন্ধ করিয়াছিলাম!"

রক্ষার অনেক চেষ্টা করা হইল ; সকলই বৃথা। দুই তিন ঘণ্টা পরে সেই বিবাহরাত্রির শেষ-ভাগেই কমলা ইহলোক পরিত্যাগ

করিয়া গেল। তাহার সেই সদ্য-প্রফুল্ল নবীন দেহ বাসরঘরে পুষ্প-সজ্জায় পড়িয়া রহিল; কিন্তু সেই জীবন্ত লাবণ্য-জ্যোতিঃ আর সে শরীরে রহিল না।

"মা, তুমি কেঁদ না" কমলার এই কথা আর তাহার সেই ভয়ঙ্কর শান্ত দৃষ্টি অভাগিনী মাতা এ জীবনে আর ভুলিলেন না।

"ডুবিল! ডুবিল!"

" *Emil.* But, I do think, it is their husbands' faults,
If wives do fall. Say, they slack their duties,
And pour our treasures into foreign laps;
Or else break out in peevish jealousies,
Throwing restraint upon us: or, say, they strike us;

* * * * *

Why, we have galls, and, though we have some grace
Yet have we some revenge."

Othello

"অদুষ্টাপতিতাং ভার্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ।
সপ্ত জন্ম ভবেৎ স্ত্রীত্বং বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ॥"

পরাশর

"স্ত্রীধনানিতু যে মোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
নারীযানানি বস্ত্রং বা তে পাপা যান্ত্যধোগতিং॥"

মনু ; ৩—৫২

"ন ভার্য্যান্তাড়য়েৎ ক্কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা।
ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেঽপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ; ৮—৯

"ডুবিল! ডুবিল!"

(১)

আকাঙ্ক্ষা

বৈশাখ মাস, বিকাল বেলা। সারাদিন ভয়ানক গরম গিয়াছে, বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু এখন পর্য্যন্তও আকাশে মেঘের সাজ হয় নাই। একজন যুবক ধীরে ধীরে হরিপুর গ্রামে প্রবেশ করিতেছিল। যুবার বয়স ত্রিশ বৎসর হইবে, দেখিতে নিতান্ত কুপুরুষ নহে। পরিধানে সাদা থানের ধুতি, স্কন্ধদেশে থানের চাদর, হাতে ছাতি; রাস্তার ধূলিতে আপাদমস্তক ধূষরিত। যুবক অনেক পথ আসিয়াছে, বড় ক্লান্ত।

অনেকে——জেলায় হরিপুর গ্রাম চিনেন। গ্রামে অনেক লোকের বাস; ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ। অন্যান্য বাড়ী হইতে কিছু দূরে এক খানা পুরাতন বাড়ী। বাহির বাড়ীতে একখানা ছোট ঘর; খড়ের চাল, মাটির দেয়াল, অনেক দিন সংস্কার হয় নাই। চালের বড়ই জীর্ণাবস্থা। দেয়ালেরও স্থানে স্থানে বৃষ্টির জলে গলিয়া পড়িয়াছে। বাড়ীর ভিতরে দুখানি ঘর; একখানি শয়নের, দ্বিতীয় খানি রান্নার। আর তিন চারিখানি ভিটা খালি পড়িয়া রহিয়াছে। গৃহস্থের অবস্থা

পূর্ব্বে ভাল ছিল, এখন মন্দ হইয়া পড়িয়াছে। শয়ন ঘরের দক্ষিণ দিকে কয়েকটী যুঁই ও বেল ফুলের গাছ; তাহাতে সাদা সাদা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। একটী তুলসী গাছ, তাহার তলায় একটী প্রদীপ, চারি দিকে বেড়া দেওয়া; বেড়ায় অপরাজিতা লতা। ঘরের কোণে কয়েকটী লঙ্কার গাছ, বেগুণের গাছ; চালে লাউ গাছ উঠিয়াছে। বাড়ীর ভিতর বেশ ঝাঁট দেওয়া, ফুট্‌ফুটে পরিষ্কার।

বাড়ীতে দুইটী লোক, স্ত্রীলোক—মা ও মেয়ে। মায়ের বয়স পঁয়তাল্লিশের উপর হইবে, বিধবা। মেয়ের বয়স পোনের কি ষোল বৎসর, হাতে শাঁখা, এয়োতির চিহ্ন,—সধবা।

অনেক দিনের কথা বলিতেছি। সেকালের অসহায়া গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বিধবার একমাত্র উপজীবিকা—মায়ে ঝিয়ে সূতা কাটিতে ছিলেন; পৈতা হইবে।

কাছে বসিয়া প্রতিবেশিনীকন্যা মুক্তাসুন্দরী আব্‌দার করিতেছেন,—তাঁহাকে পুতুল গড়িয়া দিতে হইবে। এমন সময় বাহির বাটীতে কে আসিয়া ডাকিল;—

"বাড়ীতে কেউ আছেন কি?"

বয়োবৃদ্ধা উঠিয়া বাহিরে গেলেন। এক টুকু অন্তরাল হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কে ডাক্‌চ গা?"

"আমি শ্রীনবকুমার শর্ম্মা; নিবাস শ্রীপুর।"

বৃদ্ধা কিছু জড়সড় হইলেন, নবকুমার তাঁহার জামাতা! তখন মৃদুস্বরে বলিলেন;—

"বাবা এয়েচ? এস, এস?"

এই বলিয়া পশ্চাতের দ্বার দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া জামাতাকে

ঘরের ভিতর ডাকিয়া আনিলেন। নিজে নিজ পরিচয় দিয়া বলিলেন,—

"সংসারে আর কেহ নাই, বাবা, কেবল আমি আর সদু। এত দিন পরে আজ তুমি আসিলে, তিনি থাকিলে কত সুখী হইতেন।"

নবকুমার শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া মাদুরে উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধা মুক্তাকে ডাকিয়া বলিলেন;—

"মুক্তা, তোর দিদির স্বামী আসিয়াছেন; শীগ্‌গীর করে এদিকে আয়; আর এক ঘটি জল নিয়ে আয়।"

সদুর—সৌদামিনীর—গা কাঁটা দিয়া উঠিল; স্বামী আসিয়াছেন! বিবাহের রাত্রিতে সদু একবার স্বামী দেখিয়াছিল, সে আজ পাঁচ ছয় বৎসরের কথা। সদু তখন বালিকা। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত সৌদামিনীর আর স্বামীসন্দর্শন হয় নাই। তিন বৎসর হইল, এক দিন নবকুমার পাশের গ্রাম গোপালনগরে অন্য এক শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সদুর পিতা শুনিতে পাইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইবার সময় জামাতাকে বাড়ীতে আনিবার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু জামাতা আসিতে পারেন নাই; দূরে আর এক গ্রামে তৎপর দিন তাঁহার আর একটী বিবাহের সংবাদ ছিল। তাহার পর বৎসর সৌদামিনীর পিতার মৃত্যু হইল। সহায়সম্পত্তি-হীনা বিধবা মা পেটের অন্নের সংস্থান করিতে পারেন না, বাড়ীতে কুলীন জামাতা কেমন করিয়া আনিবেন? সেই স্বামী আজ স্বয়ং আসিয়াছেন; এমন দুষ্প্রাপ্য নিধি হাতের কাছে! সদুর শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি মুক্তাকে দিয়া এক ঘটি জল পাঠাইয়া দিল।

বৃদ্ধা জামাতাকে পা ধুইতে বলিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিলেন: মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সদু, রাত্রিতে রান্নার কি আছে?"

সদু বলিল—"চারিখানি মাছ আছে মা, কিন্তু নুণ নাই।"

মা তখন পাশের বাড়ীতে ছুটিলেন।

এদিকে মুক্তার বড়ই আমোদ। মুক্তা নয় দশ বৎসরের মেয়ে, সদুর কত ছোট; কিন্তু সদু তাহার খেলার সাথী। সে সারাদিন সদুর কাছে কাছে থাকে, সদুর কাজের সাহায্য করে, সদুকে বড়ই ভাল বাসে। সে সদুর স্বামীর কাছে সদুর সহস্র গুণের পরিচয় দিতে লাগিল। নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"তোমার দিদি কেমন আছে?"

"ভাল আছে; দিদিকে এখানে ডাকিব?"

"না, না; পাগ্‌লী মেয়ে।"

বৃদ্ধা পাশের বাড়ী হইতে এক বাটী দুগ্ধ ও কিছু লবণ সংগ্রহ করিয়া বাড়ীতে ফিরিলেন। সদুকে বলিলেন;—

"তাড়াতাড়ি রান্না করগে, মা, রাত্রিতে আমি মাছ ছুঁইব না। কাল সকালে আমি রান্নায় যাইব। আমি এদিকে আর আর কাজ সারি।"

সদু রান্নায় বসিল। চারি খানি মাছ, তাহা দিয়া এক ব্যঞ্জন করিল। বেগুণ ভাজিল, একটা চচ্চড়ি করিল। কাঁচ আমের একটা টক্ করিল। মা দুধ আনিয়াছেন; গরিবের ঘরে অসময়ে জামাই আসিয়াছেন, আর অধিক কি আয়োজন হইবে?

মুক্তা কিছু কাল পরে জামাই আসার সুসমাচার পাড়ায় প্রচার করিতে গেল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী কিঞ্চিৎ জলখাবার সংগ্রহ করিয়া

জামাতাকে বাড়ীর ভিতর আনিতে গেলেন। কিন্তু তখন বড়ই গোল বাধিল। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের নৈকষ্য কুলীন জামাতা; বাড়ীর ভিতর আনিয়া জল খাওয়ান বড় সহজ ব্যাপার নহে। বৃদ্ধা অনেক সাধ্য সাধনা করিলেন; নবকুমার দশ টাকা না পাইলে বাড়ীর ভিতর যাইতে অস্বীকার করিলেন। বৃদ্ধা এরূপ কতকটা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এ তো মেঘের সাজ মাত্র; ঝড় হইলে গতি কি হইবে, বৃদ্ধা তাই ভাবিয়া আকুল হইলেন। জল খাইতে দশ টাকা, আহার করিয়া রাত্রিবাস করিতে জামাতা কত চাহিবেন, বৃদ্ধা তাই ভাবিয়া অবসন্ন হইতেছিলেন।

এমন সময় মুক্তার কাছে তত্ত্ব পাইয়া পাড়ার স্ত্রী পুরুষ কেহ কেহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারাও অনেক অনুরোধ করিলেন। কুলীন হইলে কি হয়? নবকুমার মানুষ বটে; সকলের অনুরোধে চারি টাকায় জল খাইতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু বাড়ীর ভিতরে গেলেন না; সেই ঘরেই জল খাওয়া হইল।

বাড়ীর ভিতরে থাকিয়াই সদু এ সকল কথা কতক কতক শুনিল। শুনিয়া তাহার সেই নীলোৎপল তুল্য আয়ত চক্ষু দুটী জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সমবয়স্কা প্রতিবেশিনীদিগের মৃদু পরিহাসোক্তি আর তাহার আমোদজনক বোধ হইল না।

মাতার অনুজ্ঞাসারে সৌদামিনী পরিষ্কার পাত্রে অন্ন ব্যঞ্জন সাজাইয়া শয়নঘরে আনিয়া ঢাকিয়া রাখিল। মাতা সেই ঘরেই কন্যার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

একজন সমবয়স্কা বলিল,—"ছি! ভাই, আজ এমন বেশে আছিস্! বাড়ীতে অতিথ, দেখা হইলে কি বলিবে?"

সৌদামিনী। "দেখা হইলে তো।"

সমবয়স্কা। "মর্ নেকি! তবে কি এ বাড়ীতে এসেছে তোদের কাল বিড়ালটাকে দেখ্‌তে?—হাত পা ধু'য়ে আয়, তোর চুল বেঁধে দি।"

তখন সকলে মিলিয়া সৌদামিনীর বেশ রচনা করিয়া দিল। কেহ তাহার সেই অযত্নবর্দ্ধমানা নবীন মেঘবৎ নিবিড়কৃষ্ণ সুন্দর কেশরাশি বেণীবদ্ধ করিয়া দিল; কেহ বা তাহার চম্পকগৌর কোমল গাত্র অঞ্চলে পরিমার্জ্জিত করিয়া দিল; কেহ বা তাহার সীমন্ত দেশে স্ত্রীজাতির অমূল্য ভূষণ সিন্দূরবিন্দু পরাইয়া দিল। সমবয়স্কা এক নবীনাযুবতী পরমাদরে তাহার কবরী বেল ফুলের সুন্দর মালায় বিমণ্ডিত করিয়া দিল। কাঙ্গালের মেয়ে, অলঙ্কার কোথায় পাইবে? যে দুই একখানি সামান্য গহনা ছিল, সমবয়স্কারা তাহাই সৌদামিনীকে পরাইয়া দিল। তখন ধৌত-পট্টবস্ত্রপরিহিত হইয়া সৌদামিনীর অনতিপরিস্ফুট সুকুমার দেহ অপূর্ব্ব লাবণ্যে প্রভাসিত হইয়া উঠিল।

অভাগিনি, সেই অপূর্ব্ব লাবণ্য, সেই দৈব পবিত্রতা লইয়া, সেই সুকুমার দেহে সেই দিন তুই গঙ্গার পবিত্র বক্ষে আশ্রয় লইলি না কেন?

(২)

সাক্ষাৎ

ক্রমে রাত্রি হইল। প্রতিবেশীরা অনেকেই নিজ নিজ বাটীতে চলিয়া গেলেন। বাড়ীতে রহিলেন শুধু সৌদামিনী, তাহার মাতা এবং নবকুমার। রাত্রি অনেক হইল দেখিয়া, বৃদ্ধা জামাতার কাছে গেলেন ; বলিলেন ;—

"বাবা, রাত্রি অধিক হইল ; অনেক পথ হাঁটিয়াছ ; এখন আহার করিয়া শয়ন করিবে, এস।"

নব। "আপনি কুলীনে কন্যাদান করিয়াছিলেন, তাহা কি ভুলিলেন ?"

বৃদ্ধা। "না, বাবা, ভুলি নাই। তুমি মহৎ কুলীনের সন্তান ; তোমার শরীরে দয়া মায়া আছে। আমি গরিব ; তোমার মর্য্যাদা রক্ষা করি, আমার এমন কি সাধ্য আছে ?"

নব। "তবে কি আপনার বাড়ীতে আসিয়া আমার চৌদ্দ পুরুষের মর্য্যাদা হারাইব ? আপনার বাড়ীতে, আপনার কন্যার হাতে খাইলে যে আমার মানের খর্ব্বতা হইবে, আপনি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের স্ত্রী হইয়া ইহা জানেন না, অতি আশ্চর্য্যের বিষয় !"

বৃদ্ধা। "আমি সকলই জানি, বাছা। তবে সংসারে যাহার সহায় নাই, সম্পত্তি নাই,—যে পথের কাঙ্গাল, তাহার জানিয়া লাভ কি ?"

নব। "আগে এত জানিলে আমি এখানে আসিতাম না।"

বৃদ্ধা। "আহা ! অমন কথা কি বলিতে হয় ? আজ ছয় বৎসর হইল বিবাহ করিয়া গিয়াছ, একটী দিন আসিয়াও অভাগিনীকে দেখা

দাও নাই! এ সোমত্ত মেয়ে, এ আগুনের শিখা আমি কেমন করিয়া ঘরে পুষিব?”

নব। “যাহারা কুলীনে কাজ করে, তাহারা এ সকল বুঝিয়াই করে। শত শত কুলীনের স্ত্রীর এ দশা। আমি আপনাকে ঠিক বলিতেছি, যদি আমাকে কুড়ি টাকা দিতে পারেন, তবে আজ এখানে আহার করিতে—থাকিতে পারি।”

বৃদ্ধা। “হা, দুর্গা! আমি কুড়ি টাকা কোথায় পাইব? বাছা, পৈতা কেটে, কায়ক্লেশে এক বেলা পেটে অন্ন দিতে পারি না; এক সঙ্গে কুড়ি টাকা আমি কোথায় পাইব?”

নব। “তবে আমাকে এখানে রাখিলেন কেন? আজ গোপাল-নগরে গেলে, তাহারা আমার উচিত সম্মান করিত।”

বৃদ্ধা। “তুমি আসিয়াছ, আমার ঘর পবিত্র হইল। একটা দিন তুমি থাকিয়া যাও। আমি যথাসাধ্য কা’ল তোমার মর্য্যাদা করিব।”

নব। “আপনি কি আমাকে ছেলে মানুষ পাইয়াছেন? আজ আমি থাকি, আর কা’ল আমার মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন!—কত দিবেন?”

বৃদ্ধা। “আমার কাছে তিন টাকা আছে; কা’ল যেরূপে পারি, আর দুই টাকা যোগাড় করিয়া, বাবা, তোমাকে পাঁচ টাকা দিব।”

নব। “পাঁচ টাকা দিবেন? তবে এত কথা বলিলেন কেন? আমি প্রণাম করিতেছি।”

এই কথা বলিয়া শ্রীনবকুমার শর্ম্মা গাত্রোত্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন। বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠা, গলদশ্রু-লোচনা বৃদ্ধা জামাতার পদ গ্রহণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। জামাতা সরিয়া গেলেন। তখন বৃদ্ধা বলিলেন;—

"যেয়ো না, বাবা, একটুকু অপেক্ষা কর; আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

মাতা এই বলিয়া আঁচলের কোণে চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ীর ভিতরে গেলেন; দেখিলেন,—কন্যা অবনত মুখে চিন্তায় মগ্ন। মাতা বলিলেন;—

"অভাগি মেয়ে, কপাল মন্দ! কোন মতে সম্মত করিতে পারিতেছি না। কুড়ি টাকা আমি কোথা হইতে দিব?"

মেয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকাইল। সে করুণ দৃষ্টি বর্ণন করিতে লেখনী অক্ষম। তাহাতে দুঃখ, আশা, নিরাশা, ঔদাসীন্য, অপমান,—অভিমান সকল ভাবের সংমিশ্রণ। মাতা আবার বলিলেন;—

"সময় নাই; মোটে তিনটী টাকা আছে। দেখি, মুক্তার মায়ের কাছে কিছু ধার পাই কিনা। হা ঈশ্বর! এ কাঙ্গালকে এই রাত্রি বেলায় কে ধার দিবে?"

মেয়ে বলিল;—"গেলে কি হবে, মা? কে আমাদিগকে বিশ্বাস করিয়া টাকা দিবে? আমরা কেমন করিয়া ধার শোধ করিব, মা?"

মাতা বলিলেন;—"তা একবার দেখে আসি। আবার কবে এ দিন আসিবে, তাহার ঠিক কি? আর তুই, মা, একবার ওঠ্ তো।"

মাতা মেয়ের হাত ধরিয়া তুলিলেন। নিজ অঞ্চলে তাহার মুখ মুছাইয়া তাহার ললাটদেশ চুম্বন করিয়া বলিলেন;—

"আমি যাই; যেখান থেকে পারি, কিছু আনিব। তুই একবার যা, মা; তোর স্বামী, লজ্জা কি, মা? স্বামী গুরু, পায়ে ঠেলিলেও অপমান নাই। আমি শীঘ্র আসিতেছি।"

এই বলিয়া মা চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধা ভাবিয়াছিলেন, এ সুন্দর মুখ,—করুণ অশ্রুপূর্ণ আঁখি—দেখিলে জামাতা অবশ্যই ভুলিবে।

মা চলিয়া গেলে সৌদামিনী কিছুকাল সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে ভাবিল—"মার কথা শুনিব। অদৃষ্টে এ শুভযোগ আবার ঘটিবে কি না, তাহার ঠিক কি? হাতে ধরিয়া পারি, পায়ে পড়িয়া পারি, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। বিধাতা তো অদৃষ্টে দুঃখ লিখিয়াছেন; লজ্জা করিলে কি হইবে?"

অনেক কুলীন পত্নীর স্বামীসম্ভাষণ অদ্ধোদয় যোগের ন্যায় জীবনে প্রায় দুইবার ঘটে না!

সৌদামিনী মৃদু মৃদু বাহিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার গা কাঁপিতে লাগিল, হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল, সর্ব্ব শরীর জড়বৎ অসাড় বোধ হইতে লাগিল। সৌদামিনী বাহিরের ঘরের দেয়াল অবলম্বন করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিল। তখন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে, অবনতমুখে, থরকম্পিতহৃদয়ে—নবযুবতী প্রথম স্বামী-সম্ভাষণে—সৌদামিনী সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

নবকুমার দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন: তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?" সৌদামিনীর কথা ফুটিল না। নবকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কে? এখানে কেন?"

সৌদামিনী নবকুমারের পা জড়াইয়া ধরিল; বলিল;—

"আমি তোমার স্ত্রী।"

নবকুমার পা ছাড়াইয়া একটুকু সরিয়া বসিলেন; বলিলেন;—

"কাঁদ্‌চ কেন?"

স্ত্রী। "আমার দুঃখের কি সীমা আছে?"

স্বামী। "কেন, তোমার কি দুঃখ ?"

স্ত্রী। "আজ ছয় বৎসর হইল আমি সীঁথিতে সিন্দূর পরিয়াছি ; কিন্তু এক দিনের জন্যও স্বামীর চরণ দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটে নাই!"

স্বামী। "কুলীনের স্ত্রীর সে দুঃখ সহিয়া যায়। এ দুঃখ কি তুমি একা ভোগ করিতেছ ? তুমি ছাড়া আমার আরও স্ত্রী আছে, তাদেরও তবে এ দুঃখ আছে।"

স্ত্রী। "সংসারে আমার মত অভাগিনী আরও আছে, তা জানিলে কি আমার দুঃখ যায় ? ছয় বছরে আজ দেখা দিলে, তাও শুনিতেছি, আজ এখানে থাকিবে না!"

স্বামী। "থাকিব না কেন ? আমার উচিত সম্মান কর, থাকিব।"

স্ত্রী। "আমি তোমার কি সম্মান করিব ? তোমার দাসী আমি ; একটা দিন আমাকে পায় রাখ।" এই বলিয়া সৌদামিনী স্বামীর পা পুনরায় জড়াইয়া ধরিল। স্বামী উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; বলিলেন ;—

"দেখ, রাত্রি অনেক হইয়া উঠিল। আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না। তুমি যদি ভাবিয়া থাক যে, তোমাকে কাঁদিতে দেখিলে আমি বাধ্য হইব, সে আশা ত্যাগ কর। আমি টাকা চাই, দিতে পারিবে কি না, বল।"

সৌদামিনী শিশিরসিক্ত নবপ্রফুল্ল কমলতুল্য মুখ খানি স্বামীর দিকে তুলিয়া বলিল ;—

"যেয়ো না, যেয়ো না, দাসীর কথা রাখ ; একটী দিন তোমার চরণ সেবা করিব ; আর অধিক আকাঙ্ক্ষা করি না। স্ত্রী স্বামীর কাছে কত প্রার্থনা করে ; আমার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনাটী তুমি রাখ।"

স্বামী। "আমি কথায়, কান্নায়, কি রূপে ভুলিব না ; চলিলাম।

যদি কোন দিন টাকা দিতে পার, আসিব; নতুবা আমার আশা করিও না।”

ভূমিলুণ্ঠিতা স্ত্রীর বাহুবন্ধন হইতে নবকুমার সবলে পা ছাড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন।

এমন সময়ে মাতা আসিলেন। জামাতাকে গমনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন ;—

“যাইও না; আমি পথের কাঙ্গাল; বহু কষ্টে কিছু আনিয়াছি, লও; আজ থাক।”

জামাতা। “কত?”

মাতা। “আট্‌টী টাকা আনিয়াছি।”

জামাতা বিনা বাক্যব্যয়ে দ্রুতপদ-বিক্ষেপে চলিয়া গেলেন।

মাতা উঠানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আর কন্যা? প্রবল বাত্যাভিহতা মাধবীলতার ন্যায় ধূল্যভিলুণ্ঠিতা সৌদামিনী—সংজ্ঞাহীনা,—সেই ঘরেই পড়িয়া রহিল।

পাপিষ্ঠ মুখ ফিরাইয়াও একবার চাহিল না!

আকাশে চাঁদ উঠিল, উঠানে যুঁই বেল ফুটিল; আমের বাগানে কোকিল ডাকিতে লাগিল; গৃহে অন্ন ব্যঞ্জন সজ্জিত রহিল! আর অভাগিনী মা হতভাগিনী মেয়ের পাশে সে রাত্রি সেই ঘরেই কাটাইলেন।

(৩)

বিসর্জ্জন

দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। একদিন সকাল বেলায় এক প্রকাণ্ড বজ্রা শ্রীপুরের ঘাটে আসিয়া নঙ্গর করিল। বর্ষাকাল, ভরা গঙ্গা; কলকলরবে যৌবনগর্ব্বোল্লাসিতা প্রবলস্রোতস্বিনী কূল ভাসাইয়া সাগর-মুখে চলিয়াছে।

প্রকাণ্ড বজ্রা। দাঁড়ী মাঝির রঙ্গিল পোষাক; গালপাট্টা-বাঁধা হিন্দুস্থানী তেওয়ারী দ্বারবান্। ঘাটের লোকে মনে করিল, কোন রাজরাজড়া তীর্থে আসিয়াছেন। বজ্রার ভিতর কত মূল্যবান আসবাব্। সম্মুখের বড় কুঠরী বৈঠকখানা; পুরু গালিচা পাতা; কত ঝাড়, ফানুস ঝুলান; কত ছবির আয়না খাটান! দিব্য ফরাস; তাহাতে জড়ির তাকিয়া, রূপার পিকদানী, সোণার ঝাড়বাটা, জড়োয়া ফর্সী!

ঘাটের একজন লোক জিজ্ঞাসা করিল;—"নৌকা কোথায় যাইবে?"

মাঝি উত্তর করিল;—"জানি না।"

"সে কি? কোথায় যাইবে, জান না!"

"কর্ত্তার মর্জি।"

"আসিলে কোথা হইতে?"

"কলিকাতা হইতে।"

গ্রামের ছেলেরা বজ্রার কাছে আসিয়া উকি মারিতে লাগিল। সম্মুখের কুঠরীতে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ঝিলিমিলির ভিতর দিয়া ভিতরের কুঠরীতে যেন একজন স্ত্রীলোক দেখিতে পাইল। গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, কলিকাতা হইতে হিন্দুস্থানী এক রাণী গঙ্গাসাগর যাইতে-

ছেন ; আজ শ্রীপুরের ঘাটে থাকিবেন। তখন রাণী, অন্ততঃ রাণীর নৌকা দেখিবার জন্য গ্রামের অনেক স্ত্রী পুরুষ গঙ্গাস্নানে আসিল। যাহারা আর আর দিন পুকুরে, ডোবায় স্নান করিত, তাহারাও অনেকে আসিল। নৌকার ভিতর হইতে এক জন স্ত্রীলোক সাবধানে সেই সকল স্নানার্থীকে দেখিতে লাগিলেন।

বেলা হইলে একজন লোক নৌকা হইতে নামিয়া ঘাটের দিকে গেল। একটী ব্রাহ্মণ স্নানান্তে আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, গরদের ধুতি পরিয়া, সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছিলেন ; এখন গ্রামাভিমুখে চলিলেন। ব্রাহ্মণের বয়স প্রায় চল্লিশ হইবে। নৌকার লোকটী তাঁহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল ;—

"মহাশয়ের নাম নবকুমার শর্ম্মা ?"

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন ;—

"হাঁ ;—কি প্রয়োজন ?"

লোকটী বলিল ;—"তা আমি জানি না ; আমাদের কর্ত্রী আপনাকে ডাকিয়াছেন।"

নবকুমার আরও বিস্মিত হইলেন। হিন্দুস্থানী রাণী, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে ডাকাইলেন কেন ? তবে তিথি দ্বাদশী, লাভের সম্ভাবনা ভাবিয়া ব্রাহ্মণ গাড়ুর উপর আর্দ্রবস্ত্র রাখিয়া সেই লোকটির সঙ্গে আস্তে আস্তে বজ্রায় উঠিলেন। বজ্রার বিচিত্র সাজ সজ্জা, বহুমূল্য আসবাব পত্র দেখিয়া গরিব ব্রাহ্মণ সভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু সেই রাজযোগ্য শয্যায় উপবেশন করিতে ব্রাহ্মণের সাহস হইল না। সঙ্গের লোকটী তাঁহাকে অভয় দিয়া উপবেশন করিতে সঙ্কেত করিয়া বলিল ;—

"ঠাকুর, এই স্থানে অপেক্ষা করুন, কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা হইবে।"

লোকটা চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ভয়বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে সেই বহুমূল্য শয্যার এক প্রান্তে বসিয়া রহিলেন।

ভিতরের কুঠরীর দ্বার খুলিয়া গেল। অবগুণ্ঠনবতী একটা রমণী ভিতর হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার পরিধানে বাণারসী জড়োয়া সাড়ী; হস্ত, পদ, প্রকোষ্ঠ, বাহু, কণ্ঠ, কর্ণ, কবরী—আপাদমস্তক সমস্ত দেহে বহুমূল্য অলঙ্কার। রমণীর বয়স ছাব্বিশের উর্দ্ধ হইবে না। ঈষৎ—ঈষৎ মাত্র স্থূলতা যদি দেহসৌন্দর্য্যের হানি-জনক হয়, তবে ছিদ্রানুসন্ধায়ীরা সে দেহে সে দোষ লক্ষ্য করিলেও করিতে পারে।

রমণীর হস্তে একখান রূপার থালা, তাহা টাকা এবং মোহরে পরিপূর্ণ। নবকুমার সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অবগুণ্ঠনবতী সেই রূপার থালা ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন;—

"আপনি গ্রহণ করুন।"

নবকুমার হতবুদ্ধিপ্রায় হইলেন; বলিলেন;—

"আমি—আমার—আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আপনি কে?"

অবগুণ্ঠনবতী বলিলেন;—"আমি ব্রাহ্মণকন্যা। অনেকদিন আপনার নাম শ্রুত আছি, আপনি মহা কুলীন; আমার এ সামান্য দান আপনি গ্রহণ করুন?"

নবকুমার অতি বিস্মিত, হতবুদ্ধি হইয়া একবার সেই রৌপ্য পাত্র, আর একবার সেই মহামহিমাময় নারীদেহের দিকে চাহিতে লাগিলেন। অবগুণ্ঠনবতী তখন ধীরে ধীরে আসীমন্ত মুখাবরণ উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন;—

"ঠাকুর, আমাকে চিনিতে পার?"

নবকুমার একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। নবীন মেঘের অন্তরাল

হইতে পূর্ণ শশধরের আবির্ভাবের ন্যায় অনিন্দ্যকান্তি দিব্য সৌন্দর্য্যাধার, অনাবৃত সে মুখ দেখিয়া নবকুমার চিনিতে পারিলেন না।

এ মুখ কি আর কখনও দেখিয়াছ, নবকুমার?

স্বপ্নদৃষ্ট কোন সুন্দর মুখের প্রতিকৃতি বহু দিন পরে স্মরণ করিতে চেষ্টা করিলে যেমন কিছুই মনে পড়ে না, কেবল অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় কি যেন স্মৃতিপথে উদয় হয়, চাহিয়া চাহিয়া নবকুমারের মনে সেই ভাব আসিল। একদিন নবকুমার একখানি শিশিরসিক্ত নবপ্রফুল্ল-কমলতুল্য মুখ দেখিয়াছিলেন। এ মুখ দেখিয়া কি সেই মুখের কথা মনে পড়িল? না। সে মুখ অনতিবর্দ্ধমানা নবযুবতীর; আর এ মুখ সম্পূর্ণ বিকশিত যৌবনমহিমাময়! সে মুখ আসন্ন-বিপদাশঙ্কায় ক্লিষ্টা, আত্মহারা; এ মুখ সংযতবৃত্তি, প্রশান্ত, গম্ভীর!

কাল এবং অবস্থা ঘটিত পরিবর্ত্তন মানুষ সহসা উদ্ভেদ করিতে পারে না।

রমণী বলিলেন;—"আমাকে চিনিতে পারিলে না! আমি সৌদামিনী।"

নবকুমার কি বধির হইলেন?

রমণী পুনরায় বলিলেন;—

"আমি সৌদামিনী, তোমার স্ত্রী; হরিপুরে আমার পিত্রালয়।"

নবকুমারের তখন জ্ঞানোদয় হইল; বলিলেন;—

"আপনি—তুমি—সৌদামিনী! অনেক দিন যে সৌদামিনীর মৃত্যু হইয়াছে!"

রমণী। "আমিই সৌদামিনী। মরি নাই। তুচ্ছ কুড়ি টাকার জন্য একদিন তুমি আমাকে পায়ে ঠেলিয়াছিলে;—মনে পড়ে কি?"

নব। "তুমিই যদি সৌদামিনী, তবে এত দিন আমাকে তত্ত্ব দাও নাই কেন ?"

রমণী। "তত্ত্ব দিলে কি হইত ? তোমার মর্য্যাদা আমি কেমন করিয়া রক্ষা করিতাম ?"

নব। "কেন, তোমার এত টাকা, এত গহনা, এত ঐশ্বর্য্য ; তোমার কিসের অভাব ?"

রমণী আরও একটুকু অগ্রসর হইলেন ; বলিলেন ;—

"দাঁড়াইয়া রহিলে কেন ? বসো ; আমি সব বলিতেছি।"

নবকুমার কলের পুতুলের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন।

রমণী। "সেই যে এক দিন হরিপুরে দেখা দিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, তাহার পর আর কোন দিন কি আমার তত্ত্ব করিয়াছিলে ?"

নব। "করিয়াছিলাম। কিন্তু গ্রামের লোকের কাছে শুনিয়াছিলাম, তুমি শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলে ; সেই খানে তোমার মৃত্যু হয়। সেই হইতে আমি আর হরিপুরে যাই নাই।"

রমণী। "আমার মৃত্যুর কথা শুনিয়া কি তোমার দুঃখ বোধ হইয়াছিল ?"

নব। "তাহা শুনিয়া কি লাভ ? আমি কুলীন ব্রাহ্মণ, আমার অনেক স্ত্রী ; তাহাদের কাহারও অভাব হইলে আমার দুঃখ বোধ হওয়া কি সম্ভবে ? কিন্তু তুমিই যদি সৌদামিনী হও, তবে শুন, আমি অর্থলোভে সে দিন হরিপুরে গিয়াছিলাম, অর্থ না পাইয়া রাগে চলিয়া আসি। কিন্তু সে মুখ ভুলিতে পারিয়াছিলাম না। সে কাতরভাব, সে কান্না আমি ভুলি নাই। তাহার পরদিনই আমি ফিরিয়া হরিপুর যাইতেছিলাম, লজ্জায় যাই নাই। তার পর শুনিলাম, শ্রীক্ষেত্রে তোমার মৃত্যু হইয়াছে।"

সৌদামিনীর চিত্ত কিছু বিচলিত হইল।—"সে মুখ ভুলিতে পারিয়াছিলাম না! সে ভাব, সে কান্না ভুলি নাই!"—হা ঈশ্বর! তবে অদৃষ্টে এ কি লিখিয়াছিলে?

নবকুমার বলিলেন,—"তুমি কেমন করিয়া বাঁচিলে? এতদিন কোথায় ছিলে? কোথায় তুমি এত সম্পত্তি পাইলে?"

সৌদামিনী চিত্ত পাষাণ করিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু পাষাণ কি গলিতে আরম্ভ করিল? "সে মুখ ভুলিতে পারিয়াছিলাম না!"—ঈষৎ কম্পিত স্বরে সৌদামিনী বলিল;—

"তুমি চলিয়া গেলে মার পীড়া হইল; সেই পীড়াতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। সেই বয়সে আমি নিঃসহায় হইলাম! তাহার পর গ্রামের লোকের সঙ্গে তীর্থে—শ্রীক্ষেত্রে গেলাম, সেখানে আমার ভয়ানক পীড়া হইল। সঙ্গে আপনার কেহই ছিল না; সঙ্গীরা আমাকে ফেলিয়া আসিল। দেশে প্রচার হইল, আমি সেখানে মরিয়াছি; আমি মরিলাম না।"

নব। "বাঁচিয়া আছ, চল, ঘরে চল।"

সোদা। "লোকে কি বলিবে? আজ দশ বৎসর আমি নিরুদ্দেশ।"

নব। "লোকে যা বলে, বলুক; তোমার অর্থের অভাব নাই দেখিতেছি, না হয় বিদেশে থাকিব!"

সৌদামিনীর দারুণ সন্দেহ হইল, এ তো হৃদয়ের কথা নহে, এ যে দারুণ অর্থলোভ! তখন পাষাণ পুনরায় কঠিন হইল। সৌদামিনী বলিল;—

"আমি মরিলাম না; পাপে ডুবিলাম;—ইচ্ছা করিয়া নহে; লোকের চক্রান্তে। তার পর কলিকাতা আসিলাম। ক্রমে পাপে মতি হইল; টাকা জুটিতে লাগিল;—টাকা!—কুড়ি টাকার অভাবে

একদিন স্বামীকে গৃহে রাখিতে পারিয়াছিলাম না! সেই টাকা রাশি রাশি আমার পায়ের কোণে! দারুণ প্রতিহিংসা আমার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল। তুমি টাকার কাঙ্গাল; ভাবিলাম, একদিন তোমার লালসা পূর্ণ করিব। শেষে পাপে বিতৃষ্ণা জন্মিল। ধর্ম্ম বেচিয়া যে টাকা, সে টাকায় সুখ নাই। পুরুষের থাকিতে পারে, স্ত্রীলোকের হৃদয় পুড়িয়া যায়। পাপে বিতৃষ্ণা জন্মিল; কিন্তু প্রতিহিংসা গেল না; তাই আমি আসিয়াছি।"

নব। "তুমি পাপ করিয়াছ, কে জানিবে?"

সৌদা। "তুমি জানিলে।"

নব। "আমি মনে রাখিব না, ভুলিয়া যাইব।"

সৌদা। "——আর আমার হৃদয় জানে, সে তো ভুলিবে না। দিবারাত্রি রাবণের চিতার ন্যায় জ্বলিবে।—না, তা আর হইবে না। সে অভিপ্রায়ে আমি আসি নাই। একদিন ছিল,—একদিন তোমার অনুগ্রহ পাইলে, গাছের তলায় শুইয়া, শাক অন্ন খাইয়া, চিরজীবন সুখে কাটাইতে পারিতাম; ধর্ম্ম থাকিত। কিন্তু এখন আর তাহা হইবে না। শূকরীর অধম আমি, কেমন করিয়া লোকসমাজে মুখ দেখাইব? অর্থ দিয়া দুর্গন্ধ গলিত হৃদয় কেমন করিয়া ঢাকিয়া রাখিব?"

সৌদামিনীর স্বর কাতর, ক্ষীণতর হইল। নবকুমারের বাক্য সরিল না। দরবিগলিত-অশ্রুজল-পরিপ্লাবিত-মুখে সৌদামিনী পুনরায় বলিল;—

"শোন, আমি সে আশায় আসি নাই। নারীধর্ম্ম হারাইয়াছি, নারীদেহ রাখিব না। তবে তুমি টাকা বড় ভালবাস, তাই তোমাকে দিতে আসিয়াছি।"

নব। "আমি—আমি টাকা চাই না।"

সৌদা। "কি, তুমি টাকা চাও না! সহায়সম্পত্তিহীনা মা কায়ক্লেশে আমার অন্ন জোটাইতেন; সেই পথের কাঙ্গালিনীদিগের নিকট তুমি টাকার দাবী করিয়াছিলে; আমি তোমার স্ত্রী, তোমার পায়ে পড়িয়া একদিন তোমার পদসেবা করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলাম; টাকা না পাইয়া সে প্রার্থনা তুমি রাখ নাই; আজ তুমি বল, টাকা চাই না!"

বলিতে বলিতে সৌদামিনীর জলপরিপ্লাবিত চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। নবকুমার নিতান্ত ভীত, অপ্রতিভ হইলেন।

সৌদামিনী ভিতরের কুঠরী হইতে একটী ক্ষুদ্র বাক্স আনিল; এবং অপেক্ষাকৃত স্থির ভাবে বলিল;—

"শোন, আমি যাহা করিব, তাহা স্থির করিয়া আসিয়াছি। তবে আমার এক প্রার্থনা আছে, পালন করিও। তুমি মুক্তাকে দেখিয়াছ। সে এখন স্বামীর ঘর করিতেছে। তাহার স্বামী গরিব; সংসারে মুক্তার বড় কষ্ট। আমি পাপিষ্ঠা, সে সাধ্বী; তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার যোগ্য আমি নই। কলিকাতা হইতে আমি তাহার জন্য দুই হাজার টাকা পাঠাইয়াছি। আমি যে পাঠাইয়াছি, তাহা সে বুঝিতে পারিবে না; চিঠিতে আমি নিজ নাম দেই নাই। তুমি কোন উপায়ে এই বাক্সটী তাহাকে দিও। কয়েকখানি সামান্য অলঙ্কার ইহাতে আছে; নূতন, কেহ তাহা ব্যবহার করে নাই। মনে করিয়াছিলাম, নিজ হাতে অলঙ্কারগুলি তাহার গায় পরাইয়া দিব; কিন্তু এ পাপহস্তে তাহার গাত্র স্পর্শ করিব না।—এ জন্মে আমার একটী প্রার্থনা তুমি রাখ।"

নব। "তোমার কথা রাখিব, কিন্তু তুমি—"

সৌদা। "আমি আর না——"

নৌকার যে পার্শ্ব নদীস্রোতের দিকে ছিল, সৌদামিনী সে দিকের প্রশস্ত জানালা খুলিয়া দিল। তাহার মুখশ্রী যেন কিরূপ এক অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল। গভীর গঙ্গা কলকল করিয়া প্রবল বেগে বহিতেছিল। সৌদামিনী জানালার নিকট দাঁড়াইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল ;—

"দেখ, একদিন গভীর রাত্রিতে শয্যায় শুইয়া ভাবিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম, পাপীর প্রায়শ্চিত্ত কি? ভাবিতেছিলাম নরকযন্ত্রণা কিরূপ? ভাবিতে ভাবিতে আমার তন্দ্রা আসিল"—বলিতে বলিতে সৌদামিনীর কথার স্বরও যেন কিরূপ অস্বাভাবিক হইয়া উঠিল।—"স্বপ্ন দেখিলাম, আমার গৃহে আগুন লাগিয়াছে। সমস্ত গৃহ দগ্ধ হইতেছে, আমার শয্যা পর্য্যন্ত আগুন আসিল; শত শত অগ্নিশিখা আমার অঙ্গস্পর্শ করিতে আসিল। আমি তাপে পুড়িতে লাগিলাম। পলাইবার জন্য যেন পাশের জানালা খুলিলাম। নীচে চাহিয়া দেখিলাম,—কুলকুল রবে শীতল গঙ্গাস্রোত বহিয়া যাইতেছে। দগ্ধ হৃদয় শীতল করিবার জন্য আমি সেই গঙ্গাস্রোতে ঝাঁপ দিলাম!"

নবকুমার চাহিয়া দেখিলেন,—কথা শেষ হইতে না হইতে, নিমেষ মধ্যে সেই সালঙ্কারা স্বর্ণ-প্রতিমাবৎ সুন্দর দেহশালিনী সৌদামিনী গবাক্ষদ্বার দিয়া সেই গভীর গঙ্গাস্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল! ক্ষণকালের জন্য নবকুমার নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন; শেষে উচ্চৈঃস্বরে "ধর, ধর; ডুবিল! ডুবিল!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

"কি হইল!" "কি হইল!" বলিয়া নৌকার দাঁড়ী, মাঝি, দ্বারবান অগ্রসর হইল। ঘটনা বুঝিতে পারিয়া কেহ কেহ জলে পড়িয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সে অনুসন্ধানে শেষে ঘাটের লোক যোগ

দিল। কিন্তু সৌদামিনীকে আর পাওয়া গেল না। জীবিত কি মৃত সে দেহ আর মানুষের চক্ষুগোচর হইল না!

তখন চৌকিদার আসিল, থানার লোক আসিল। দ্বারবান, মাঝিরা যাহা জানে, বলিল। নবকুমার কেবল বলিলেন "ধর, ধর; ডুবিল! ডুবিল!"

নবকুমার সেই দিন হইতে উন্মাদ হইল।

উকীল বাবু

" Let husbands know
Their wives have sense like them : they see and sme
And have their palates both for sweet and sour,
As husbands have."

Othello

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলা ক্রিয়াঃ॥
শোচন্তি যাময়ো যত্র বিনশ্যন্ত্যাশু তৎকুলং।
ন শোচন্তি তু যত্রৈতা বর্দ্ধতে তদ্ধি সর্ব্বদা॥
যাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রাতিপূজিতাঃ।
তানি কৃত্যাহতানিব বিনশ্যন্তি সমন্ততঃ॥
তস্মাদেতাঃ সদা পূজ্যা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ।
ভূতিকামৈর্নরৈর্নিত্যং সংকারেষূৎসবেষু চ॥"

মনু; ৩, ৫৬—৫৯

উকীল বাবু

প্রথম পরিচ্ছেদ

"দিদি,

অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই; অনুমতি কর তো আগামী বুধবার তোমার বাড়ীতে যাইব। শনিবার দিন সকালে ফিরিয়া আসিব; তাহা হইলে উকীলবাবুর কি আপত্তি হইতে পারে? অবসর থাকিলে তুইছত্র অনুমতিপত্র লিখিও। নিবেদন ইতি।

সেবিকা

শ্রীতরঙ্গিণী দাসী।"

১২৮—সন বৈশাখ মাসের একদিন বিকাল বেলায় দেবনগর গ্রামে নিজ অন্তঃপুরে বসিয়া বাড়ীর গৃহিণী শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী উদ্ধৃত চিঠিখানি পড়িতেছিলেন। তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করে নাই, যুবতী; অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাঙ্গী; কিন্তু পরমা সুন্দরী। তাঁহার গৌরদেহ স্বর্ণালঙ্কারে ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে মুখে ঈষৎ বিষাদের কালিমা অনুভূত হয়।

পত্র পড়িয়া অন্নদাসুন্দরী একটুকু হাসিলেন; বলিলেন;—"ছুঁড়ির রকম দেখ! উকীলবাবু আপত্তি করিবেন, না মাষ্টারমহাশয় ছুটি

দিবেন না ? আচ্ছা, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইবে।” অন্নদা তরঙ্গিণীর কাছে অনুমতিপত্র লিখিলেন।

অন্নদাসুন্দরীর স্বামী বাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মধুপুরে ওকালতী করেন; বয়স পঞ্চাশের তিন বৎসর কম; সুগঠন পুরুষ, দিব্য পসার, সঙ্গতিপন্ন লোক। শুনা যায়, বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী শেষ বয়সে ভদ্রাসন ছাড়িয়া পুত্রের ব্যবসাস্থলে থাকিতে অসম্মত; স্ত্রীকে কাছে রাখিলে বাড়ীতে মাতার শুশ্রূষা চলে না; এই জন্য উকীলবাবু একক মধুপুরে থাকেন; অন্নদা শাশুড়ীর কাছে বাড়ীতেই থাকেন। দেবনগর হইতে পাল্কীতে চারি ঘণ্টায় মধুপুরে যাওয়া যায়। উকীলবাবু শনিবার কাছারী করিয়া রাত্রিতে বাড়ীতে আসেন; রবিবার বাড়ীতে থাকিয়া, সোমবার আবার মধুপুর যাইয়া থাকেন। ছয় বৎসর হইল উকীল-বাবুর প্রথমা স্ত্রীর কাল হইয়াছে; তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। সেই বৎসরই অন্নদার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়। অন্নদার পিতা দরিদ্র ছিলেন। পাত্রের বয়াধিক্য বিষয়ে তিনি মনোযোগ করিলেন না। তাঁহার কিঞ্চিৎ অর্থলাভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি ভাবিয়াছিলেন, এরূপ সঙ্গতিপন্ন ঘরে এ বিবাহে অন্নদার সুখ হইবে।

তরঙ্গিণী অন্নদার খুল্লতাতপুত্রী; অন্নদার দুই মাসের ছোট। তরঙ্গিণীর স্বামী বাবু অনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী, বি, এ, শ্যামনগর স্কুলের হেড মাষ্টর। তরঙ্গিণী শ্যামনগরে স্বামীর কাছে থাকেন। তথা হইতে রেলপথে দেবনগর পাঁচ ঘণ্টার পথ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অন্নদার শয়নগৃহ সুন্দর, সুপরিষ্কৃত। উত্তম খাট, উত্তম শয্যা, উত্তম মশারি। আলনা, বাক্স, তোরঙ্গ, আর ড্রেসিং টেবল---তাহাতে সুবৃহৎ আয়না। আরও কত গৃহশোভাকর সামগ্রী শ্রেণীবদ্ধ সাজান। বুধবার সন্ধ্যার পর সেই শয্যায় বসিয়া পাণ খাইতে খাইতে অন্নদা এবং তরঙ্গিণীতে আলাপ হইতেছিল।

অন্নদা। "আচ্ছা, ভাই, চিঠিতে তুই ওরূপ লিখিলি কেন?"

তরঙ্গিণী। "কি লিখিয়াছিলাম?"

অন্ন। "উকীলবাবুর আপত্তির কথা।" তরঙ্গিণী হাসিল, বলিল;—"কেন, অন্যায় লিখিয়াছি নাকি? গত বৎসর যখন আমি তোর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলাম, মনে পড়ে কি?—শনিবার দিন আমি পৃথক্ শুইতে চাহিয়াছিলাম, তুই বলিলি, 'তা হইবে না, এতদিন পরে দেখা—দুই ভগিনী একত্র থাকিব।' তারপর রাত্রিতে তোর স্বামী বাড়ীতে আসিলেন; তুই বৈঠকখানায় তাঁহার শয্যা পাঠাইয়া দিলি। বাবু রাত্রিতে দুই বার বাড়ীর ভিতর আসিয়া আমাদিগকে জাগাইলেন। ঘরে এ, ও, তা—কত কাজ! মনে পড়ে কি, দিদি? আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম; তোর শাশুড়ীর কাছে যাইতে চাহিলাম, তুই যাইতে দিলি না।"

অন্ন। "দূর্, ছুঁড়ি! সপ্তাহে এক দিন আসা, ঘরে কাজ থাকে না?"

তর। "কাজ থাকিলে তাহা কি পরদিন সকালে করা যাইত না?"

অন্ন। "তবে তুই কি বুঝিয়াছিলি?"

তর। "আমি বুঝিয়াছিলাম——বাবু পাগল হইয়াছিলেন। তাঁর

যে বয়স, পাঁচ দিনের বিরহ—তিনি আমাকে সে দিন পরম শত্রু মনে করিয়াছিলেন।”

অন্ন। “তোর্ প্রতি কি তাঁর কোন সন্দেহ হইয়াছিল নাকি, হাবী?”

তর। “বোন্ না হইয়া যদি ভাই হইতাম, তবে সে কথা খাটিত কিনা, বিবেচনার স্থল হইত।”

অন্ন। “মর্, লক্ষ্মীছাড়ি! বয়সে কি সন্দেহ বাড়ে?”

তর। “যোগ্য বয়স হইলে বাড়ে না; আরম্ভে মনের যে মিলন, বয়সে তাহা থাকিয়া যায়। কিন্তু———”

তরঙ্গিণী বুঝিতে পারিল যে কথা অনেক দূর গড়াইয়াছে, সুতরাং সে থামিল।

অন্ন। “‘কিন্তু’ কি?”

তর। “না, দিদি।”

অন্ন। “বল্ না, আমার কাছে ইতস্ততঃ?”

তর। “তা না, দিদি; তবে কি জানিস্, আমরা যখন তোর কথা লইয়া আলাপ করি———”

অন্ন। “‘আমরা’ কে?”

তর। “আমরা?—আমি আর—আর—” তরঙ্গিণী হাসিয়া বলিল, “আর মাষ্টারমহাশয়!”

অন্ন। “বেশ্, তোদের বুঝি আর কাজ নাই; আমাদের কথা লইয়া দিন কাটা’স্?—তার পর?”

তর। “আমরা বলি, তুই পরম সুখে আছিস্। কিন্তু——”

অন্ন। “সুখে আছি? আবার ‘কিন্তু’ কিরে?”

তর। “‘কিন্তু’ এই যে, তুই একটুকু সাবধানে থাকিস্।”

অন্ন। "কেন ?"

তর। "দিদি, তোর বুদ্ধি নাই! এই বয়সে এমন স্বামী বশ করিতে পারিলি না!"

অন্ন। "স্বামী বশ কি লো ?"

তর। "তোর মত হাবা আর দেখি নাই।"

অন্ন। "সপ্তাহে দুদিন দেখা ; কি করিব ?"

তর। "তুই সঙ্গে থাকিস্ না কেন ?"

অন্ন। "সংসার চলে না যে ?"

তর। "স্বামী কি সংসার ছাড়া ? ঐত ফাঁকি !"

অন্ন। "তার ঔষধ কি।"

তর। "যে স্বামী স্ত্রীর বশীভূত নয়, পরিণামে সে স্বামী স্ত্রীতে সন্দেহ করে।"

অন্নদা হাসিল, বলিল ;—"দ্যাখ্, তরঙ্গিণি, এবার তুই হারিলি। স্বামী আমার বশ না হইতে পারেন, কিন্তু আমাতে তাঁহার সন্দেহ নাই।"

তর। "নাই—তা তুই জানিস্ ?"

অন্ন। "জানি।"

তর। "দুদিন থাকিয়া যাইতে পারিতাম, তবে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতাম।"

অন্নদা তখন হাসিয়া উঠিল ; বলিল ;—"এখন বুঝিলাম চিঠির কথা। শনিবারে উকীলবাবুর আপত্তি ; না, তোর ছুটির শেষ ? তুই কি শপথ করিয়া আসিয়াছিস্, যে শনিবার দিন ফিরিয়া যাইবি ?"

তর। "শপথ করিয়া আসি নাই ; বলিয়া আসিয়াছি, শনিবার দিন ফিরিব। আমি সেখানে না থাকিলে অনেক অসুবিধা হয়।"

অন্ন। "তা আমি ছাড়িব না।——তবে হা'র মান্।"

তর। "আমি শ্রীমতী তরঙ্গিণী দেবী, সংসারে কাহারও কাছে হা'র মানিব? তা পারিব না।"

অন্ন। "তবে থাক্, পরীক্ষা করিয়া দ্যাখ্।"

তর। "দেখিবি?"

অন্ন। "দেখিব।"

তর। "একটুকু কাগজ আর কলম দোয়াত দে, দিদি; না গেলে চিন্তিত হইবেন, একখানা চিঠি লিখিয়া দি।"

অন্নদা কাগজ, দোয়াত ও কলম আনিয়া দিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তরঙ্গিণী চিঠি লিখিল,——

"মান্যবরেষু,

অধিনীর নিবেদন এই যে, আমার অসুখ হওয়াতে শনিবার দিন উপস্থিত হইতে পারিব না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে আরও দুই দিবসের বিদায় দিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি।

অনুগতা

শ্রীতরঙ্গিণী দাসী।

আমোদ যা'ক ;

প্রাণাধিক,

দিদি কোন মতেই ছাড়িয়া দিবেন না ; সুতরাং শনিবারে যাওয়া হইল না। সোম কি মঙ্গলবার যাইব। মঙ্গলবার ষ্টেসনে আসিও। এ রবিবার তোমার অনেক কাজ আছে, মনে আছে তো ? আমি কাছে নাই বলিয়া একেবারে হা'ল ছাড়িয়া দিও না। এখানে সকলেই ভাল আছেন। রোজ চিঠি লিখিও। এখন বিদায়।

তোমার

তরি।"

চিঠি লেখা হইলে তরঙ্গিণী বলিল ;—"চিঠির খাম আছে, দিদি ?" অন্নদা দেরাজ খুলিয়া এন্‌ভেলাপ বাহির করিয়া দিল।

অন্ন। "কি লিখিলি, আমাকে দেখাইবি ?"

তর। স্বামীর কাছে চিঠি লিখিলাম ; তুই দেখিবি, দিদি ?"

অন্ন। "না, না,——যদি কিছু থাকে !"

তর। "পাগল ! থাকিবে আবার কি ? ত্থাখ্ না।"

অন্নদা তখন চিঠি পড়িল।

অন্ন। "দুরকম কেন রে?"

তর। "ছুটির দরকার হইলে, স্কুলের অনেক ছেলে ওরকম দরখাস্ত দেয়। মাষ্টারমহাশয় তাহা বুঝিতে পারেন; সেই জন্য নীচের টুকু লিখিয়াছি।"

অন্ন। " 'তরি' কি লো?"

তরঙ্গিণীর সুন্দর মুখ তখন স্মিতপ্রভাসিত হইয়া উঠিল। তরঙ্গিণী বলিল;—

" 'তরি' আমার আদরের নাম!"

অন্নদা আবার চিঠি পড়িতে লাগিল। সেই সামান্য চিঠি পড়িতে পড়িতে সে যেন এক নূতন জগতে প্রবেশ করিল। তাহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মৃদু বায়ুস্রোত কোথা হইতে যেন ফুল্লকুসুম-সৌরভরাশি আনিয়া তাহার প্রাণ আমোদিত করিয়া তুলিল। দূর-সমানীত কলবিহঙ্গনিনাদ যেন তাহার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। চক্ষু সেই নূতন রাজ্যের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইল। যে ভূমিতে অন্নদার বাস, এ তো সেই একা একা ভাববিশিষ্ট, লতাপুষ্পপাদপ-পরিবর্জ্জিত, বারিকণাপরিশূন্য মরুভূমি নহে! তুমি ভিন্ন, আমি ভিন্ন; স্ত্রী এক, স্বামী আর;—এ ভাব তো এ নূতন জগতে নাই! এ রাজ্য ক্লান্তিময় নহে; শান্তির স্থান; এ রাজ্যে হৃদয়ের শূন্যতা নাই, পরিপূর্ণতা; এ রাজ্যে সন্দেহ নাই, পূর্ণ বিশ্বাস!

ক্ষুদ্র চিঠি পড়িয়া অন্নদার মনে এত ভাব আসিল! অন্যের পূর্ণতা দেখিলে মানুষ নিজের অভাব সম্যক্ বুঝিতে পারে।

চিঠি পড়া হইলে অন্নদা প্রশান্ত দৃষ্টিতে তরঙ্গিণীর দিকে চাহিয়া দুর্দ্দমনীয় মনোবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া, করুণস্বরে বলিল;—

"তরঙ্গিণী, এসংসারে তোরাই সুখী। কত পাপে পাপিষ্ঠা আমি, তাই সংসারে আসিয়াছিলাম—আসিয়াছিলাম, বোন্, দিন কাটাইতে!"

অন্নদা বারণ রাখিতে পারিল না; তাহার দুই চক্ষু স্বতঃ জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। পতি-সোহাগ-সৌভাগ্যশালিনী তরঙ্গিণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া অন্নদার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া অতি মধুর, মৃদু স্বরে বলিল;—

"কি দুঃখ তোর, দিদি? সোণার সংসার তোর; রাজ অট্টালিকা, সুখের গৃহস্থালী; ধন, জন, সম্পদ, ক্ষমবান্ স্বামী; ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে কোলে একটী ছেলে পাইলে তোর মত অদৃষ্ট কয় জনের হয়, দিদি? আমাদের কি সুখ? কায়ক্লেশে সংসার চালাই; কষ্টে পেটে দুটী অন্ন দি; কষ্টে গায়ে কাপড় দিয়া লজ্জা রক্ষা করি!"

অন্ন। "দিনান্তে দুটী মিষ্টি কথা শুনিস্, সেই কায়ক্লেশের মধ্যে—হৃদয়মাখা আদর পা'স্?"

তর। "কাঙ্গালের সেই তো এক মাত্র সম্পত্তি!"

অন্ন। "সে যে লক্ষ রাণীর নিত্য কামনার ধন, বোন্!"

তর। "তা তুইও পাবি, দিদি। তোর এমন রূপ, এমন স্বভাব; কদিন তাহার মহিমা অজ্ঞাত থাকিবে?"

যে স্ত্রী সংসারে থাকিয়া স্বামী বশ করিতে না পারিলেন, তিনি আত্মবশ করিতে শিক্ষা করুন। সাবধান! সাবধান! স্বামী যাঁহার বশ নহেন, আত্মবশ না থাকিলে সে স্ত্রীর পতন মুহূর্ত্ত সাপেক্ষও নহে।

অন্নদা স্বামী বশ করিতে পারুক আর না পারুক, আত্মবশ করিতে শিখিতেছিল। সে হাসিয়া বলিল;—

"তোর হাসি মুখ দেখিলে মন প্রফুল্ল হয়, তরঙ্গিণি। কাল সকালে

চিঠি ডাকে পাঠাব। এ কয় দিন তোর এখানে থাকিয়া যাইতে হইবে। ছুটি পাবি তো ?"

তরঙ্গিণী কেবল হাসিল। সে হাসির অর্থ,—হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী (বি, এ-ই হউন, আর এম, এ-ই হউন) কর্ম্ম নয় শ্রীমতী তরঙ্গিণী দেবীর প্রার্থনা (প্রার্থনা ?) অগ্রাহ্য করা।

অন্ন। "তবে পরীক্ষা করিয়া দেখাবি ?"

তর। "কি দেখাইব ?"

অন্ন। "এই যে বলিলি——"

তর। (হাসিয়া) "তা ভুলিস্ নাই, দিদি ? বড় আমোদ হইবে। তুই ঠিক থাকিতে পারিবি তো ?"

অন্ন। "কেন ? তুই কি আমার সর্ব্বস্বধন আঁচলে বান্ধিয়া লইয়া যাইবি নাকি ?"

তর। "লইয়া যাইব না, দিদি, পারি তো তোর আঁচলে বান্ধিয়া দিয়া যাইব।"

তরঙ্গিণী বুঝিতে পারিয়াছিল, দিদির মন দিন দিন নীরস হইতেছে। যুবতীর আত্মসংযম ভাল ; কিন্তু চিত্তের নীরসত্ব কি প্রার্থনীয় ? তাই সে মনে মনে স্থির করিল, একটা কৌতুকের উপলক্ষ করিয়া দিদির মনটাকে একটুকু প্রফুল্ল করিব। আর, পারি তো এই সঙ্গে দিদির সেই উচ্ছৃঙ্খল দুষ্প্রাপ্য ধন দিদির অঞ্চলে বান্ধিয়া দিব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেখিতে দেখিতে বৃহস্পতি, শুক্রবার কাটিয়া গেল। শনিবার বিকাল বেলায় তরঙ্গিণী দিদিকে জিজ্ঞাসা করিল;—

"বাবু কখন বাড়ীতে আসেন ?"

অন্ন। "রাত্রি হয়, সাড়ে নয়টা, দশটা বাজিয়া যায়। বাড়ীর ভিতরের লোকজন অনেক দিন টের পায় না, বাবু কখন আসেন।"

তর। "কোথায় খাওয়া দাওয়া করেন ?"

অন্ন। "এই ঘরে। তরি, তুই যে আজ কি কর্‌বি, তা আমাকে এখনও বল্‌বি না ?"

তর। "বলিব বই কি। আচ্ছা বাবুর কাপড় টাপর কিছু ঘরে আছে ?"

অন্ন। "এই তোরঙ্গের মধ্যেই আছে।"

তর। "দিদি, তোরঙ্গটা খোল না, ভাই।"

অন্নদা তোরঙ্গ খুলিয়া দিল। তরঙ্গিণী তাহার মধ্য হইতে কোঁচান দিব্য কাল ফিতে পেড়ে ধুতি একখানা বাহির করিল; ইস্ত্রি করা পরিষ্কৃত সার্ট একটা এবং উড়ুনী একখানাও বাহির করিল। হাসিয়া হাসিয়া সেই ধুতি, সার্ট ও উড়ুনী আলনার উপর রাখিয়া দিল।

অন্ন। "সং সাজ্‌বি নাকি ?"

তর। "তা দেখ্‌বি এখন।"

পাড়াগাঁয়ের নিয়ম, রাত্রি আট্‌টার মধ্যে বাড়ীর খাওয়া দাওয়া সব মিটিয়া গেল। লোকজন যে যাহার স্থানে শয়ন করিতে গেল। বাহির বাড়ীতে দরওয়ান জাগিয়া রহিল,—দরজা খুলিয়া দিতে হইবে; বাবু রাত্রিতে বাড়ী আসিতে পারেন। ঝী, চাকরাণী শয়ন করিল,—বাবু

কখন আসেন, ঠিক কি ? প্রয়োজন হয় ডাকিয়া তুলিবেন। অন্নদা আহার করিল না—স্বামীর অপেক্ষায় শনিবার রাত্রির এই নিয়ম অন্নদা স্বয়ং করিয়াছিল। আজ তরঙ্গিণীও অভুক্ত রহিল, দিদির সঙ্গে আহার করিবে। অন্নদা তিন জনের অন্নব্যঞ্জন শয়নগৃহে আনিয়া রাখিয়া দিল।

রাত্রি সাড়ে আট্‌টার সময় দুই ভগ্নী সকল কাজ সারিয়া শয়ন গৃহে গিয়া বসিল। তখন তরঙ্গিণী অন্নদার দীর্ঘ কেশরাশি বেণীবদ্ধ করিয়া দিল। অন্নদা অনেক আপত্তি করিল, তরঙ্গিণী তাহা মানিল না.—বাক্স হইতে ফরাসডাঙ্গার দিব্য সাড়ী বাহির করিয়া দিদিকে একরূপ জোর করিয়া পরাইয়া দিল। অঞ্চলে পরিমার্জ্জিত করিয়া তাহার মুখশ্রী সমুজ্জ্বল করিয়া দিল। এইরূপে দিদিকে সাজাইয়া তরঙ্গিণী বলিল ;—

"দিদি, এখন আমি সাজি ?"

অন্ন। "তুইও সাজ্‌বি! কেন, আমার সঙ্গে সরিকি কর্‌বি নাকি "?

তর। "যা করি দেখ্‌বি এখন।"

এই বলিয়া দরজার খিল আঁটিয়া দিয়া তরঙ্গিণী তখন আলনা হইতে সার্ট নামাইয়া গায় পরিল। দিব্য করিয়া গলার বোতাম আঁটিয়া গলার চিক্, হার ঢাকিয়া ফেলিল। ইস্ত্রি করা কফ্; হাতের চুড়ি, লবঙ্গফুল ঢাকিয়া গেল। তখন পরিধানের সাড়ীর পরিবর্ত্তে সেই কোঁচান ফিতে পেড়ে ধুতি তরঙ্গিণী পুরুষোচিত ছন্দে পরিধান করিল। বস্ত্রের শতকুঞ্চিত দোদুল্যমান অগ্রভাগ তরঙ্গিণীর পদযুগল পরিচুম্বিত করিয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। বিপদ ঘটিল সেই বিপুল-বিস্তার, নিবিড়কৃষ্ণ কেশরাশি লইয়া ; তরঙ্গিণী স্বয়ং তাহা এক বেণীবদ্ধ

করিয়া মস্তক পরিবেষ্টন করিয়া বান্ধিল। তখন আরসির নিকট দাঁড়াইয়া উড়ুনী দ্বারা কেশরাশি ঢাকিয়া অপূর্ব্ব পাগড়ী রচনা করিল। এইরূপে বেশ রচনা শেষ হইলে, তরঙ্গিণী অজাতশ্মশ্রু, সুকুমারদেহ তরুণ যুবকের মনোহর শ্রী ধারণ করিল।

অন্নদা দেখিয়া দেখিয়া শেষে বলিল ;—

"তুই যে অবাক্ করিলি, তরঙ্গিণি! এই বেশে তুই মাষ্টর মহাশয়ের নিকট পাঠ নিস্ নাকি ?"

তর। "তা যাই করি, দিদি, আমাকে চিন্‌তে পারিস্ ?"

অন্ন। "নাকে দুল, কাণে মাক্‌ড়ী, চুল ঢেকে করেছিস্ পাগড়ী! হাবী, তোকে আমি চিন্‌তে পারব না!"

তর। "আজ শনিবার কিনা, তাই বুঝি, দিদি, তোর মুখে কবিতা ফুট্‌ছে? আচ্ছা দিদি, তুই চিন্‌লি, বাবুও কি আমাকে চিন্‌তে পার্‌বেন ?"

অন্ন। "কেন, বাবু কি অন্ধ? তোর এই মুখ, নাকে দুল, কাণে মাক্‌ড়ী দেখিয়াও কি চিন্‌তে পার্‌বেন না ?"

তর। "আমি হাবী, না, তুই হাবী ? রাত্রি বেলায় জামাজোড়া পাগড়ী-পরা আমাকে হঠাৎ দেখিলে, বাবু কি আর আমার দুল মাক্‌ড়ীর দিকে চাহিবেন ? আর, আমি যে আসিয়াছি তাহাও তিনি জানেন না। না হয়, দুলটা খুলিয়াই রাখি।"

অন্ন। "তোর মুখ দেখিয়াও কি চিনিবেন না ?"

তর। "আমার তো বিশ্বাস, যদি—যদি (হাসিয়া) মাষ্টর মহাশয় স্বয়ং আমাকে এ অবস্থায় দেখেন, তিনিও চিনিতে পারিবেন না। ত্বাখ্, দিদি, আয়নার দিকে চাহিয়া ; আমিই আমাকে চিনিতে পারি না!

অন্ন। "এখন কি করিবি ?"

তর। “আসিবার সময় কি হইল ?”

অন্ন। “হয়েছে বই কি ; দশটা যে বাজে !”

তর। “তবে, দিদি, তাড়াতাড়ি কর্। খাটের পাশের জানালাটা খুলিয়া দে ; আলোটা ভাল করিয়া বাড়াইয়া দে।”

এই বলিয়া তরঙ্গিণী ঘরের কপাট খুলিয়া এমন সহজভাবে পুনর্ব্বার বন্ধ করিল যে, বাহির হইতে সামান্য ধাক্কা দিলেই খুলিয়া যায়। তার পর এক খণ্ড সূক্ষ্ম কাপড় লইয়া ভিতরের দিক হইতে সেই খোলা জানালায় পরদার মত করিয়া ঝুলাইয়া দিল। বায়ুস্রোতে সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড বিচলিত হইতে লাগিল।

এইরূপে সমস্ত আয়োজন শেষ হইলে তরঙ্গিণী বলিল ;—

“চল্, দিদি, এখন চুপ্টী করিয়া শুইয়া থাকি !”

অন্ন। “চল্ ; কিন্তু তোর লজ্জা করিবে না ? তিনি আসিয়া তোকে এই বেশে দেখিবেন !”

তর। “দিদি, আমারও যেন এখন কেমন কেমন লাগ্‌ছে ;—খুলে ফেল্‌বো ?”

অন্ন। “এত কষ্ট করিয়া এখন ?—না। লজ্জাই বা কি ? তুই তো আর শুধু গায় রইলি না।”

তর। “তা বুঝিস্, দিদি। তোর কাপড়ে আমাকে একটুকু ঢেকেঢুকে রাখিস্। আর সাবধান ! আগে কথা কইবি না ; আগে দেখিব, আমাদিগকে দেখিয়া কি করেন।”

তখন নেটের মশারি ফেলিয়া সেই পরিষ্কৃত শুভ্র শয্যায় স্মিতপ্রফুল্ল-মুখে দুই ভগিনী আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া শুইয়া রহিল। চন্দ্রালোক-প্রভাসিত সরসীবক্ষে কেহ যেন যুগ্ম মন্দারমালা ভাসাইয়া দিল।

এমন সময়ে বহির্ব্বাটীতে পাল্কীবাহকের অব্যক্ত শব্দ শ্রুত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উকিল বাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাল্কী হইতে নামিয়া বাহক-দিগকে বিদায় দিলেন। তাহারা নিকটবর্ত্তী বাজারে রাত্রিবাসের জন্য গেল। দ্বারবান বাহিরের দরজা বন্ধ করিল। বাবু কাহাকেও ডাকিলেন না। আস্তে আস্তে ভিতর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। চাকরচাকরাণী সকলেই নিদ্রিত অথবা নিদ্রার ভাণ করিয়াছিল। বাবু নিঃশব্দপদসঞ্চারে নিজ শয়নকক্ষের দিকে গেলেন। দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, দরজা বন্ধ, কিন্তু জানালা খোলা রহিয়াছে; ঘরে আলো জ্বলিতেছে। কাহারও সাড়াশব্দ নাই।

অধিক বয়সে বিবাহ করিলে অধিকাংশ পুরুষ নিতান্ত স্ত্রৈণ হইয়া পড়ে; সহস্র অনুরোধ যদি এক দিকে টানে, যুবতী ভার্য্যার সামান্য বক্রদৃষ্টি তাহাদিগকে সহজে অপর দিকে পরিচালিত করে। স্ত্রৈণ হওয়া দোষের কি প্রশংসার বিষয়, তাহার বিচার আমরা করিব না। এই মাত্র বলিতে পারি যে, শরৎবাবুর ব্যবহারে ঐরূপ প্রশংসা কি নিন্দার কোন হেতু ছিল না। আবার কেহ কেহ বা অধিক বয়সে বিবাহ করেন—বংশ রক্ষা করিবার জন্য। স্ত্রীর সঙ্গে ইহাঁদের অন্য সম্বন্ধ খুব কম। তুমি, তুমি; আমি, আমি। আমার পথে আমি চলিব; কিন্তু তোমার পথে কাঁটার বেড়া দিব। আমার স্বাধীনতায় তুমি বাদী হইতে পারিবে না; কিন্তু তোমার পদে শৃঙ্খল বান্ধিয়া ছাড়িয়া দিব। খাও, পর, অভাব নাই,—লোকে দেখিবে; হৃদয় পুড়িয়া যা'ক,—কেহ দেখিবে না!

শয়নগৃহে আলো, অথচ অন্নদার কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া উকিল-বাবুর মনে হইল,—আমার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, অন্নদা ঘুমাইয়া

পড়িয়াছে। এইরূপ ঘুমাইয়াই তো অন্নদা জীবন কাটায়! উকিল বাবুর মনে কোনরূপ অনুতাপ উপস্থিত হইল কি না বলিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার মনে এক কৌতূহল জন্মিল ;—দেখিব অন্নদা কি কি করিতেছে, কি ভাবে রহিয়াছে! তখন অতি সাবধানে বারান্দায় উঠিয়া জানালার পরদা অপসারিত করিয়া শয্যার দিকে দৃষ্টি করিলেন। মশারি খাটান ;—তবে অন্নদা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ডবল্-উইক্ কেরসিনের ল্যাম্প ; গৃহ প্রায় দিবাভাগের ন্যায় আলোকিত হইয়াছে। চাহিয়া দেখিলেন ; দেখিয়া তাঁহার মাথা দিয়া অগ্নিশিখা নির্গত হইল ;—খাটে শুইয়া অন্নদার আলিঙ্গনবদ্ধ কে এ ? ঘোর দুর্দ্দমনীয় সন্দেহবেগে উকিলবাবু অন্ধ হইলেন। তখন ছুটিয়া প্রবেশদ্বারে আঘাত করিতেই দ্বার খুলিয়া গেল। বিষম সন্দেহ, জ্বলন্ত ক্রোধ এবং দারুণ প্রতিহিংসায় হতজ্ঞান শরৎচন্দ্র নক্ষত্রবেগে শয্যার পার্শ্বে গেলেন। মশারি অপসারিত করিয়া পুরুষবেশধারিণী তরঙ্গিণীর পৃষ্ঠে বিষম মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব, আকস্মিক বিপদে পড়িয়া দুই ভগিনী উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল। শরৎচন্দ্র তরঙ্গিণীর পাগড়ী-পরিবেষ্টিত বেণী আকর্ষণ করিয়া তাহাকে খাটের নীচে ফেলিয়া দিলেন। অন্নদা চীৎকার করিয়া কহিল ;—

"কর কি ! কর কি ! ও আমার—"

শরৎ। "ও তোমার—,হারামজাদি !"—বলিয়াই নিদারুণ মুষ্ট্যাঘাত। আঘাতে অন্নদা শয্যাশায়ী হইল! এই অবসরে তরঙ্গিণী একটুকু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল ;—

"আমাকে চিনিতে পারিলেন না ?"

শরৎ। "তোমাকে চিনিব রে শা—!" বলিয়াই পদাঘাত।

অন্নদা বলিল, "থাম, থাম ; ও যে—!" কথা শেষ না হইতেই

শরৎচন্দ্র তাহার কুন্তলরাশি আকর্ষণ করিয়া তাহাকে ভূমিতে পাতিত করিয়া দারুণ প্রহার করিলেন। তরঙ্গিণী নিরুপায় হইয়া তাড়াতাড়ি সার্টের বোতাম খুলিতে সমস্ত বক্ষাচ্ছাদন ছিঁড়িয়া ফেলিল। বলিল ;—

"আমি তর—"

শরৎ। "তুমি রে শা—? দেখাচ্ছি!"—বলিয়া পুনরায় সপাদুক পদ উত্তোলন করিলেন।

তরঙ্গিণী আলুলায়িত বেশে, অনাবৃতপ্রায়-বক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বিশৃঙ্খল কেশরাশি বক্ষ এবং পৃষ্ঠ দেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। গলদেশে ডায়মণ্ডকাটা চিক্ জ্বলিয়া উঠিল; বক্ষে স্বর্ণহার উৎকম্পিত হইয়া উঠিল; কাণের মাকৃড়ী, হাতের চুড়ি, লবঙ্গফুল স্পষ্ট দৃষ্ট হইল।

দেখিয়া উত্তোলিত পদে শরৎচন্দ্র ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। তরঙ্গিণী অর্দ্ধাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল ;—

"আমি তরঙ্গিণী!"

অন্নদা বলিল ;—"সর্ব্বনাশ হইল; ছুঁড়িকে মেরে ফেল্লে যে!" শরৎচন্দ্রের উত্তোলিত পদ ধীরে ধীরে ভূমি স্পর্শ করিল; তাঁহার বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয় একবার অন্নদার মুখের দিকে, একবার তরঙ্গিণীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সর্ব্বনাশ করিয়াছি! তখন পর্য্যায়ক্রমে একবার অন্নদার দিকে, একবার তরঙ্গিণীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া, ধীরে ধীরে, বাক্যহীন শরৎচন্দ্র শয্যা হইতে দূরে যাইতে লাগিলেন। দরজার নিকটে যাইয়া জোড়হস্তে বলিলেন ;—

"অন্নদা, আমি পশু! মাপ কর।"

তখন ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন ;—

"তরঙ্গিণি, আমি পশু, আমি গরু, গাধা; আমার প্রায়শ্চিত্ত নাই।"

—বলিয়াই মুক্ত পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে শরৎচন্দ্র দৌড়িয়া বাহিরের দিকে পলায়ন করিলেন। এই ঘটনা বিবৃত করিতে যে সময় লাগিল, তাহার শতাংশের এক অংশ মধ্যে সমস্ত কার্য্য ঘটিয়াছিল। শরৎচন্দ্র গৃহ হইতে বাহির হইলে, তাড়াতাড়ি পরিহিত বস্ত্রের ছন্দ পরিবর্ত্তন করিয়া তরঙ্গিণী দরজার কাছে আসিয়া ডাকিল ;—

"দাঁড়ান, যাইবেন না, যাইবেন না ; মাথার দিব্য !"

শরৎচন্দ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় !

এমন সময় অপর গৃহ হইতে রাধী চাকরাণী বাহির হইল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে রাধী জিজ্ঞাসা করিল ;—

"কি হইয়াছে, মাসী ঠাক্রুণ ?"

তর। "কে ? রাধী ?—শীঘ্র যা ; বাবু চলিয়া গেলেন ; শীঘ্র যা ; ভিতরে লইয়া আয়।"

রাধী। "বাবু আসিয়াছেন ?"

তর। "আসিয়াছিলেন ; চ'লে' যাচ্ছেন ; শীঘ্র যা ; ফিরাইয়া আন্।"

রাধী। "ফিরাইয়া আন্‌বো ?"

তর। "হাঁলো, হাঁ ; শীঘ্র যা !"

অসময়ে নিদ্রাভঙ্গে শ্রীমতী রাধিকা সুন্দরী প্রথমে নিন্দা করিলেন বিধাতার,—পরদাসীত্ব বিধাতা কেন অদৃষ্টে লিখিয়াছিলেন ? তার পর নিন্দা করিলেন মাসী ঠাকুরাণীকে—একি ফরমাইস্ ! শেষে নিন্দা করিলেন বাড়ীর কর্ত্তার—এত রাত্রিতে দৌড়াদৌড়ি কেন ? বলা বাহুল্য যে, এই সকল নিন্দাবাদ রাধিকাসুন্দরী নিজ মনে মনেই করিলেন। তখন শ্রীমতী রাধিকাসুন্দরী ওরফে রাধী চাকরাণী বাবুকে ফিরাইতে বাহিরের দিকে গেলেন। বাবু কোথায়ও নাই, বাহিরের দরজা খোলা। দরওয়ানজী কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দরজা খোলার

শব্দ পাইয়া "কোন্ হ্যায়্ রে" বলিতে বলিতে অন্ধকারে লাঠি ও খড়ম খুঁজিতে খুঁজিতে বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছেন; এখন তিনিও বাহির হইলেন।

রাধী। "দরওয়ানজী, বাবুকে যাইতে দেখিয়াছ?"

দর। "বাবু ভিতরে গিয়াছেন।"

রাধী। "বাহিরের দিকে চলিয়া আসিয়াছেন। দরজা খোলা কেন?"

দর। "কে যেন এই মাত্র দরজা খুলিল।"

রাধী। "'দরওয়ানজী, শীগ্গীর করে' বাহিরে যাও; খুঁজিয়া দেখ; বাবু রাগ করিয়াছেন।"

দরওয়ানজী তখন দ্রুতপদে বাড়ীর বাহিরে রাস্তায় যাইয়া এদিক ওদিক খুঁজিয়া অবশেষে বাজারে বাবুকে দেখিতে পাইল। বাবু পাল্কীতে উঠিয়াছেন, বাহকগণ প্রস্তুত। দরওয়ানজীকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বাবু বলিলেন;—

"বাড়ীতে যাও; বড় জরুরি কাজ পড়িয়াছে, আজ রাত্রেই আমার মধুপুর যাইতে হইবে।—পাল্কী উঠাও।"

বাহকগণ তখন পাল্কী লইয়া মধুপুরের পথে যাত্রা করিল। দুই টাকা অতিরিক্ত বক্শিশের লোভে ক্লান্ত বেহারাগণ যাইতে স্বীকার করিয়াছিল।

দরওয়ানজী তখন বাড়ীতে ফিরিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাধীকে বাবুর অন্বেষণে পাঠাইয়া তরঙ্গিণী ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, অন্নদা যে ভাবে ছিল, সেই ভাবেই ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে। দারুণ ব্যথায় তরঙ্গিণীর সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত, কিন্তু অন্নদার যে হৃদয়েও শেল বিন্ধিয়াছে। যে যুবতী স্ত্রী বয়োবৃদ্ধ স্বামীর প্রেমের আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি ভ্রান্ত। অনুচিত বয়ঃবৈষম্য দাম্পত্যপ্রেমের অনুকূল নহে। এমত স্থলে অনেকে আদর পাইয়া থাকেন। অনেকে অকপট আদর পান। প্রণয় আর আদরে যে পার্থক্য, অনেক স্ত্রীপুরুষ তাহা বুঝে না। যদি বুঝিত, তাহা হইলে এসংসারে ভগ্নহৃদয়ের সংখ্যা অনেক বাড়িত। সে আদরও অন্নদার লাভ হয় নাই। কিন্তু আজ এ কি বিড়ম্বনা! চরিত্রে সন্দেহ! অন্নদা নিদারুণ মর্ম্মব্যথায় ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িয়াছিল।

তরঙ্গিণী গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া আছে আসিয়া দিদিকে ডাকিল; ——উত্তর নাই। পুনরায় ডাকিল——উত্তর নাই। তখন স্নেহময়ী ভগিনী বাহু ধরিয়া দিদিকে উঠাইয়া বসাইল। অন্নদা কাঁদিতেছিল না; চক্ষু অতি প্রশান্ত; অশ্রুপাতের চিহ্নও নাই। ভগিনীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া অন্নদা বলিল;—

"তরঙ্গিণি, কবে যাইবি, স্বামীর কাছে চিঠি লিখিয়াছিস্?"

তর। "মঙ্গলবার। কেন, দিদি, তা জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস্ কেন? আহা! তোর যে কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দিদি!"

অন্ন। "কাপড় ছিঁড়িয়াছে, ভাই? আমার যে——আমার যে সংসারের বন্ধন ছিঁড়িয়াছে, বোন্!"

তর। "কি ছাই ভস্ম বলিস্, দিদি। আজ্‌কের সকল অনর্থের মূল আমি।"

অন্ন। "তোর দোষ কি, বোন্? আমার কপালের দোষ। যখন হইতে সংসার বুঝিতে পারিয়াছি, সেই হইতেই আমি বুঝিয়াছি, আমার অদৃষ্ট মন্দ, সেই হইতেই সুখের আশা করি নাই। কিন্তু এত বিড়ম্বনা যে অদৃষ্টে ছিল, তাহা তো ভাবি নাই! স্বামীর ভালবাসা পাই নাই;——তোর কাছে হৃদয়ের কথা বলিতে ইতস্ততঃ কি? প্রাণের বোন্ তুই,——স্বামীর ভালবাসা পাই নাই, সহিয়াছিলাম; সন্দেহ সহিয়া থাকিতে পারিব না, বোন্!——"

অন্নদা কাঁদিয়া ফেলিল।

কান্না দেখিয়া তরঙ্গিণীর ভরসা হইল। ধীরে ধীরে দিদির কাছে বসিল, ধীরে ধীরে দিদির কণ্ঠদেশ বাহুদ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহার গলদশ্রুপরিপ্লাবিত মুখ নিজ বক্ষস্থলে ন্যস্ত করিল। অন্নদা নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

তরঙ্গিণী দেখিল, আমোদের পরিণাম ভয়ঙ্কর হইতে চলিল; হিতে বিপরীত বা হয়! কিন্তু হৃদয়শালিনী তরঙ্গিণী সাহস ছাড়িল না; অন্নদার নীরব কান্নার বেগ কিছু শমিত হইলে বলিল;—

"দিদি, একটা কথা বলিব?"

অন্ন। "কি বলিবি, ভাই?"

তর। "তোর কেন বিশ্বাস হইল, বাবু তোকে সন্দেহ করেন?"

অন্ন। "কেন বিশ্বাস হইল? নিজ চক্ষে দেখিলি; এই দারুণ প্রহার খাইলি, তবুও জিজ্ঞাসা করিস্?"

তর। "এই মাত্র! বড় মা'র খাইয়াছি, দিদি, গা ব্যথা কর্‌ছে, হাস্‌তে পারি না,——" (অন্নদা ভগিনীকে বক্ষে টানিয়া আনিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল)—"নতুবা তোর কথায় হাসিতাম, দিদি।"

অন্ন। "তোর হাসি পায়?"

তর। "হাসি পায় না? আমরা স্ত্রীলোক, চক্ষে কি হৃদয়ে যত সহিতে পারি, যত স্থির থাকিতে পারি, পুরুষ কি তা পারে? আমরা যে ভাবে শুইয়াছিলাম, দেখিয়া কোন্ স্বামীর মাথা স্থির থাকিতে পারে? ভাগ্যে হাতে লাঠি, ছড়ি কিছু ছিল না; তাই প্রাণে বাঁচিয়াছি!"

অন্ন। "তাই হাসি পায়?"

তর। "শুধু তা নয়, দিদি। আর, জব্দ কি আমরা হইয়াছি?" তখন তরঙ্গিণী হাসিয়া বলিল;—"জোড় হাত, ভূমিষ্ঠ প্রণাম, দেখিস্ নাই, দিদি!"

দিদি তখন না পারেন হাসিতে, না পারেন কাঁদিতে।

অন্ন। "আচ্ছা, মুখ দেখিয়াও কি মেয়ে মানুষ কি পুরুষ মানুষ চেনা যায় না?"

তর। "দিদি, তোর বুদ্ধি নাই। রাত্রি বেলা সার্ট গায়ে পাগ্‌ড়ী-পরা মেয়ে মানুষ বিছানায় শোয়া দেখিলে কে চিন্‌তে পারে? আমি যদি রাত্রিবেলায় তোর খালি বিছানায় অমন বেশে মশারি খাটাইয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া শুইয়া থাকিতাম, তা হ'লে তুইও কাছে এসে চম্‌কে পালাতি!"

অন্নদার মুখে ঈষৎ হাসি দেখা দিল, সে বলিল;—"তা যা'ই বলিস্, তরঙ্গিণি, অমন করিয়া মা'র কি আর হঠাৎ দিতে হয়?"

তর। "সেটা পুরুষের চটা মেজাজ,—এক মিনিটে অন্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু, দিদি, অনেক ক্ষণ থাকে না; ভুল বুঝিতে পারিলে তখনই পায়ে পড়ে। আমরা স্ত্রীলোক, সে বিষয়ে কিন্তু আমাদের অভিমান বড় বেশী। তার দৃষ্টান্ত খুঁজ্‌তে হবে না।—আমাদের চক্রান্তে পড়িয়া তোর স্বামী হঠাৎ একটা অপরাধ করিয়াছেন; নিজের ভুল দেখিয়া তখনই এত যোড়হাত, এত দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন; কিন্তু তুই এখনও সে অপরাধ ভুলিতে পারিলি না, দিদি?"

অন্ন। "তোর কথার তরঙ্গে মাষ্টার মহাশয় হাবুডুবু খান্, তরঙ্গিণি, আমি আর পার্‌ব কি ?"

এমন সময় রাধী চাকরাণী আসিয়া বলিল ;—"বাবু ফিরিলেন না, বড় জরুরি কাজ নাকি ; মধুপুর চলিয়া গিয়াছেন।"

তর। "কেমন করিয়া গেলেন ?"

রাধী। "পাল্কীতে।"

তর। "তবে তুই এখন শো গিয়া।"

রাধী চলিয়া গেলে তরঙ্গিণী বলিল ;—"জরুরি কাজ তো ভারি! লজ্জায় মুখ দেখাইতে সাহস হয় না, তাই পলায়ন।—তা দিদি, একটা কাজ করিতে হইবে ; কাল সকালে একজন লোক পাঠাইয়া বাবুকে কড়া তলব দিতে হইবে।"

অন্ন। "কেন, তোর মা'র খাইবার সাধ ফুরায় নাই কি ?"

তর। "তা নয়, ভাই ; এর একটা শোধ লইতে হইবে। এই মাটিতে পড়িয়া বাবু একবার তোর পায় ধরিয়া সাধিবেন, আমি চক্ষে দেখিব, তবে ছাড়িব।—মেয়ে মানুষের গায় হাত তোলা !"

অন্ন। "তা তুই যা পারিস্ করিস্। চল্, এখন শুইগে।"

তর। "খাইব না ? আমার তো বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, দিদি।"

তরঙ্গিণী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,—দিদির মন সম্পূর্ণ প্রফুল্ল না করিয়া ছাড়িবে না। না খাইয়া শুইলে তো চিত্তের বিষণ্ণতা যায় না ; তাই জোর করিয়া দিদিকে লইয়া খাইতে বসিল। খাওয়া দাওয়া শেষ হইলে তরঙ্গিণী বলিল ;—"চল্ দিদি, এখন শুই গিয়া।"

অন্ন। "তুই যা ; আমি কাপড়খানা ছেড়ে আসি।"

তরঙ্গিণী শয্যায় গিয়া শয়ন করিল।

অন্নদা কাপড় ছাড়িয়া শয্যার পাশে আসিয়া বসিল।

অন্ন। "বড় ব্যথা পাইয়াছিস্, বোন্; কিন্তু আমার মাথা খাস্, অনঙ্গবাবুর কাছে এ সকল কথা বলিস্ না।"

তর। "বলিলে কি আর তিনি এর প্রতিশোধ তোর উপরে লইবেন?—তিনি হাসিয়া মরিবেন।"

অন্ন। "বলিলে আমি লজ্জায় মরিব।"

তর। "তুই পাগল! আয়, শো এসে।"

অন্ন। "তরি, তুই স্বর্গের দেবকন্যা; মর্ত্ত্যে আসিয়াছিলি আমার ভগিনী হইয়া আমাকে সংসারে বান্ধিয়া রাখিতে।"

তর। "দেবকন্যাই হই, আর মানুষীই হই, কাল দেখিবি আমার ক্ষমতা।"

অন্নদা তখন প্রাতঃসূর্য্যকিরণোদ্ভিন্ন নবীন কমলদলবৎ তরঙ্গিণীর মৃদুস্মিতপ্রভাসিত সুন্দর অধরদল পরিচুম্বিত করিয়া ভগিনীর কণ্ঠাবলম্বনে শয়ন করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

এই চিঠি প্রাপ্তিমাত্র আপনি বাড়ী রওয়ানা হইবেন। যদি আজ দিন রাত্রির মধ্যে কোন সময় আপনি বাড়ীতে না পৌছেন, তবে থাকার এবং আহারের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবেন, দিদি আর আমি আগামী কল্য অতি প্রত্যূষে শ্রীচরণ অভিমুখে যাত্রা করিব; সঙ্গী লোক এবং পাল্কী ইত্যাদি স্থির করা গিয়াছে। নিবেদন ইতি——রবিবার।

সেবিকা
শ্রীতরঙ্গিণী দাসী।"

মধুপুরে উকিল বাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেলা নয়টার সময় এই চিঠি পাইয়া প্রমাদ গণিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বাড়ী যাওয়াই স্থির করিলেন। অবশ্যম্ভাবী বিপদের সম্মুখীন হওয়া বীরের কার্য্য; কিন্তু উকিলবাবুর হৃদয় কাঁপিতে লাগিল;—একজন নয়, দুইজন!

পূর্ব্ব রাত্রিতে বিষম লজ্জায় বাড়ী হইতে আসিবার সময় উকিল বাবুর মনে নানা ভাবের উদয় হইয়াছিল।—এরূপ উৎকট সন্দেহ কেন হঠাৎ আমার মনে আসিল? অন্নদার চরিত্রে কোন দিন তো তিলমাত্র সন্দেহের হেতু দেখা যায় নাই! তবে আজ এমন ভ্রম কেন হইল? তখন অনেক কথা মনে পড়িল। এত অনাদর, এত অবহেলা,—কিন্তু একদিনও তো একটী রূঢ় কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হয় নাই! যখন দেখা—সপ্তাহে দুদিন মাত্র!—তখনই তো সে মুখ—আমি নরাধম! নরাধম!—তখনই তো সে মুখ স্নেহের কাঙ্গাল! আত্মসুখ সুবিধার দাস আমি, স্বচ্ছন্দে এখানে দিন কাটাই; আর একা একা সেই বাড়ীতে—রত্ন! রত্ন!—অন্নদা, অন্নদা, এবার মাপ কর!

—আর তরঙ্গিণী! বিপদ তো সেই খানে! কেমন করিয়া তাহাকে মুখ দেখাইব! যে মা'র দিয়াছি!—শেষে স্থির করিলেন, দু এক দিন যাক্; একদিন যাইয়া তরঙ্গিণীর পায় পড়িব।

কিন্তু চিঠি পাইয়া আর গৌণ করা সঙ্গত বোধ হইল না,—সাহসও হইল না। যা করেন ঈশ্বর, যাইব।

রাত্রি আট্‌টার সময় বাবুর পাল্কী বাড়ীতে পৌছিল। বাবু বাহিরে বৈঠকখানায় বসিলেন। ভিতরে যাইয়া কি ভাবে সম্ভাষণ করিবেন, তাই ভাবিতে লাগিলেন। বিষম সমস্যা! তখন সঙ্গে আনীত পোর্টমেণ্ট খুলিয়া উকিলবাবু তাহার ভিতর হইতে দুই খানি উৎকৃষ্ট বানারসী সাড়ী বাহির করিলেন। একখানি ক্ষুদ্র কাগজে পেন্সিল দিয়া লিখিলেন,

—"তরঙ্গিণি, যদি তোমরা অভয় দাও, তবে বাড়ীর ভিতর আসি।" চিঠি আর কাপড় বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দিয়া বাবু বৈঠকখানায় বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন।

কাপড় এবং চিঠি পাইয়া তরঙ্গিণী অন্নদাকে বলিল ;—

"দিদি, বাবু তো উপস্থিত; কিন্তু বাছা ভিতরে আসিতে ভয় পাচ্চেন্! দ্যাখ্ চিঠি পড়িয়া। আর কাপড় আনিয়াছেন আমাদের জন্য। এই বার বাগে পড়িয়াছেন, দাসখত লিখাইয়া লইব, তবে ছাড়িব!"

অন্ন। "খত লইলে কি হইবে রে? উকিল মানুষ, সপ্তাহ না যাইতেই খতের ম্যাদ্ চলিয়া যাইবে।"

তর। "এবার আর ম্যাদ্ যাইয়া কাজ নাই! পাকা লেখাপড়া করিয়া লইব। দিদি, কাপড় একখানা তো আমার দেখ্ছি; তা আমি পরি?"

অন্ন। "এখনই পর্‌বি?"

তর। "হাঁ, দিদি।"

এই বলিয়া তরঙ্গিণী একখানা সাড়ী খুলিয়া পরিল। বাবু আংশিক প্রায়শ্চিত্তের জন্য অধিক মূল্যে সাড়ী দুখানি কিনিয়া আনিয়াছিলেন। কাপড় পরিয়া তরঙ্গিণী বলিল ;—"তোর খানা তুই পর্, দিদি।" এই বলিয়া অপর খানা খুলিয়া ফেলিল।

অন্ন। "দুর পাগ্‌লি! সাড়ী পরার কি এই সময়?"

তর। "সময় অসময় বুঝি না ; তোর পর্‌তেই হইবে।

অন্ন। "তুই ক্ষেপিয়াছিস্? এমন করে সেজেগুজে বসিতে তোর লজ্জা কর্‌বে না?"

তর। "এও কি সার্ট পাগ্‌ড়ী পর্‌ছি নাকি? তুই যদি না পরিস্,

তবে কোন্—এ কাপড় নেবে!—আর সার্ট পরার কাহিনীটা খবরের কাগজে ছাপাইয়া দিব।”

মাষ্টার মহাশয়ের কাণে কথা গেলেই সংবাদ পত্রে ছাপানের তুল্য ফল হইবে!

অন্ন। “মা’র খাইয়া তোর স্ফূর্ত্তি বাড়িয়াছে! সঙ্কেতটা অনঙ্গ বাবুর জানা থাকিলে প্রয়োজনে লাগিতে পারে।”

তর। “তা তুই বলিস্; এখন কাপড় ছাড়্।”

রাধী চাকরাণী বাবুকে খবর দিল,—“মাসীঠাকুরাণী ডাকিতেছেন।” বিচারালয়ে নীয়মান তস্করের ন্যায় উকিল বাবু চাকরাণীর সঙ্গে ভিতর বাড়ীতে যাত্রা করিলেন। চাকরাণীকে বিদায় দিয়া বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন। তরঙ্গিণী অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিল;— “আমাকে চিন্‌তে পারেন?”

উকিলবাবু তরঙ্গিণীকে সাড়ী-পরা দেখিয়া কতক আশ্বস্ত হইলেন; বলিলেন (যোড় হস্তে);—

“তরঙ্গিণি, তুমি আমার ছোট বোন্, আমাকে ক্ষমা কর।”

তর। (হাসিয়া) “ক্ষমা প্রার্থনা উচ্চ আদালতে করিতে হইবে। আপনি উকিল মানুষ, ভাল করিয়া দরখাস্ত করুন।”

শরৎ। “শুধু উকিলে হইবে না,—ব্যারিষ্টার চাই! তুমি সাহায্য না করিলে হইবে না।”

তর। “চেষ্টা করুন।”

শরৎচন্দ্র অন্নদার কাছে গেলেন।

বানারসী সাড়ীর অঞ্চলে আসীমন্ত মস্তক আবরিত করিয়া অধো-মুখে অন্নদাসুন্দরী বসিয়াছিলেন। স্বামীর নিকট-আগমনেও বিচলিত হইলেন না। জানু পাতিয়া বসিয়া শরৎচন্দ্র অন্নদার পদযুগল ধারণ

করিবার চেষ্টা করিলেন। অন্নদা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া বসিল। শরৎচন্দ্র সকাতরে তরঙ্গিণীর দিকে চাহিলেন। তরঙ্গিণী দিদিকে হাত ধরিয়া তুলিল, বলিল;—"ক্ষমা কর, দিদি; পায়-পড়া অপরাধীকে ক্ষমা করায় যশ আছে।—তবে আমি মনে করিয়াছিলাম,—আজ—আজ একখানা—দাসখত লেখাইয়া লইব।"

শরৎচন্দ্র গলবস্ত্র হইয়া স্ত্রীর চরণযুগল স্পর্শ করিয়া বলিলেন;—"তুমি সাক্ষী, তরঙ্গিণি, আজ হইতে আমি ক্রীতদাস। যদি কখনও অবাধ্য হই, উচিত শাস্তি পাইব।"

অন্নদা আর অভিমান রাখিতে পারিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরদিন অতি প্রত্যূষে অন্নদা পার্শ্ববর্ত্তী তরঙ্গিণীর শয়নঘরে যাইয়া দেখিল তরঙ্গিণী তখনও নিদ্রিতা। কি স্বপ্ন দেখিয়া যেন তাহার মুখ হাসিময় হইয়া উঠিয়াছে। অভিনব স্ফূর্ত্তিভরে অন্নদা ভগিনীর গণ্ডে গাঢ় চুম্বন করিল। তরঙ্গিণী জাগরিতা হইয়া দিদির প্রফুল্লমুখ দেখিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল। শেষে কথা ফুটিল।

তর। "দিদি, তার পর ?"

অন্ন। "সে অনেক কথা। মূল এই,—ঠাকুরাণী অনেক দিন হইল কাশীবাসের জন্য জেদ করিতেছেন; মাসীঠাকুরাণীর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিলেই তাঁহাকে কাশীতে পাঠান হইবে।"

তর। "আর তুই ?"

অন্ন। (হাসিয়া) "আমাকে বোধ হয় মধুপুর যাইতে হইবে।"

তর। "এখন আমায় কি দিবি, দিদি ?"

অন্নদা স্মিতমুখে পুনরায় ভগিনীকে চুম্বন করিল।

মঙ্গলবার। বিকালে তিনটার সময় তরঙ্গিণী যাইবে। অন্নদা আরও দুদিন থাকিবার জন্য ভগিনীকে অনুরোধ করিয়াছিল; তরঙ্গিণী স্বীকার হইল না। দরিদ্র সংসার, বেশী চাকর চাকরাণী নাই, কাছে না থাকিলে স্বামীর সহস্র অসুবিধা—ইত্যাদি। সেই দিনই যাওয়া স্থির হইল। এ দুদিন দুই ভগিনী কেবল হাসিময়। বাড়ীর লোকজনগুলিও যেন প্রফুল্লচিত্ত হইল। বাড়ীর শ্রীও ফিরিল।

সময় হইয়া আসিল। তরঙ্গিণী বলিল;—

"অনুরোধটী রাখিস্, দিদি, মধুপুর হইতে চারি ঘণ্টার পথ।"

এমন সময় শরৎচন্দ্র সেখানে আসিয়া বলিলেন;—

"সময় হইয়াছে, তরঙ্গিণি;——অনুরোধ কি?"

তর। "অনুরোধ এই—যদি আপনি ছুটি দেন, তবে দিদি দিন কয়েকের জন্য একবার শ্যামনগর যাইতে পারেন।"

শরৎ। "ছুটি দিবার, না দিবার অধিকার কি আর আমার হাতে আছে? যে দিন ইচ্ছা হয়, যাইও, অন্নদা; কিন্তু একটুকু সাবধানে থাকিও;—শনিবারের বৃত্তান্ত তরঙ্গিণী অনঙ্গবাবুর কাছে বলিতে ছাড়িবেন কি?"

তরঙ্গিণী হাসিয়া শরৎচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বিদায় প্রার্থনা করিল, বলিল;—"অনেক ছেলেমো করিয়াছি; আমাকে নির্লজ্জ মনে করিবেন না। এখন বিদায় দিন্।"

শরৎ। "লক্ষ্মী বোন্ তুমি; বয়সে সম্পর্কে বড় হইয়াও তোমাকে ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়! আমার পশু-ব্যবহারের কথা মনে রাখিও না, তোমার কাছে এই প্রার্থনা। তরঙ্গিণী সলজ্জ মৃদু হাসি হাসিল। তখন দিদিকে প্রণাম করিয়া বলিল;—"এখন, যাই, দিদি।"

অন্নদার চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়াছিল; গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন;—"আমার প্রাণ কাড়িয়া লইয়া চলিলি, তুই; আর কি বলিব? সর্ব্বদা চিঠি লিখিস্।" গলদশ্রুনয়নে ভগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া অন্নদা তরঙ্গিণীকে পাল্কীতে উঠাইয়া দিলেন। বৃদ্ধ চাকর নবকান্ত এবং রাধীকে সঙ্গে দিয়া শরৎবাবু স্বয়ং তরঙ্গিণীকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসিলেন।

বাষ্পীয় শকট দ্রুতবেগে চলিল। দিদিকে ছাড়িয়া আসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তরঙ্গিণীর হৃদয় শূন্য শূন্য বোধ হইল। শেষে পতিসন্দর্শন-লোলহৃদয়া ভাবিল, গাড়ী নক্ষত্রবেগে চলে না কেন?

পিতার অভিমান

"*Prince.* Capulet ! Montague !
See, what a scourge is laid upon your hate,
That heaven finds means to kili your joys with love."

Romeo and Juliet

"অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্ম্ম সমাসেন জ্ঞেয়ঃস্ত্রীপুংসয়ো পরঃ॥
তথা নিত্যং যতেয়াতাং স্ত্রীপুংসৌতু কৃত ক্রিয়ৌ।
যথা নাভিচরেতাং তৌ বিযুক্তা বিতরেতরং॥"

মনু, ৯—১০১-১০২।

পিতার অভিমান

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুসুমহাটী গ্রামে ত্রিলোচন দত্তের নিবাস। বাড়ীর বৈঠকখানায় বসিয়া দত্ত মহাশয় গ্রামের রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন।

দত্ত। "ঘোর কলি, চাটুয্যে মহাশয়, ঘোর কলি! কালে আরও কি ঘটে, কে বলিতে পারে?"

চট্টো। "ব্যাপার টা কি?"

দত্ত। "কি হইয়াছে শুনিবেন? প্রবোধের বয়স কুড়ি ছাড়াইয়া গেল; কলির অর্দ্ধেক আয়ু তো যায়! আজ দুবৎসর যাবৎ নানা স্থানে সম্বন্ধ উপস্থিত হইতেছে, কোন স্থানেই ঘটিয়া উঠিতেছে না। মেয়ে ভাল হয় তো, পাওয়া থোওয়ার সম্ভব থাকে না, আবার যেখানে [illegible] পাওয়ার সম্ভব দেখা যায়, সেখানে মেয়ে পশন্দ হয় না। এই গত অগ্রহায়ণে বসন্তপুর এক মেয়ে দেখিতে গিয়াছিলাম। অপ্সরার মত দিব্য মেয়ে; হাত, পা, মুখ যেন ফুল দিয়া গড়ান——"

চট্টো। "এমন মেয়ে! তবে সেখানে ঠিক করিলেন না কেন?"

দত্ত। "বাপের এক পয়সার সঙ্গতি নাই; পাঁচ ভরি সোণা দিতে অশক্ত। এমত স্থলে কেমন করিয়া কার্য্য করি?"

চট্টো। "তা ঈশ্বর-আশীর্ব্বাদে আপনার তো অপ্রতুল নাই। আপনার পুত্রবধূকে আপনি হীরা মণি মুক্তায় জড়াইয়াও রাখিতে পারেন!"

দত্ত। "দেশের নিয়ম দেখুন। নীরদার যখন বিবাহ দিয়াছিলাম, পঞ্চাশ ভরির কথা ছিল, পঁয়তাল্লিশ ভরি দিয়াছিলাম বলিয়া কত নিগ্রহ সহিয়াছিলাম। তা আমার বেলায় কি আমি ঠকিব? আমাকে কি কেহ মাপ করিয়াছিল?"

চট্টো। "দেশের নিয়মের কথা বলিবেন না। দুদিন পরে আর ভদ্র লোকে মেয়ের বিবাহ দিতে পারিবে না।"

দত্ত। "—তার পর গিয়াছিলাম রামদেবপুর। বুনেদি ঘর, বড় মানুষ, সব ভাল; মেয়েটী—থাক্; মেয়ে পশন্দ হইল না। কি করি? সোণা গয়নার লোভে কি এক অপশন্দ মেয়ে ঘরে আনিব?"

চট্টো। "সেও কি হয়! দুটি নয়, চারিটি নয়, আপনার একটী মাত্র ছেলে। ছেলেও বড় হইয়া উঠিয়াছে; দেখিয়া শুনিয়া এক স্থানে ঠিক করুন।"

দত্ত। "দেখিতে দেখিতে তো হদ্দ হইলাম। যদি বা এক স্থানে কার্য্য ঠিক করিলাম, কিন্তু ছেলের মত হয় না।

চট্টো। "বলেন কি? প্রবোধ তো ভারি সুবোধ ছেলে; তার এরূপ আচরণ আশ্চর্য্যের বিষয়।"

দত্ত। "তাই তো বলিতেছিলাম—কলিকাল, কালে আরও কত দেখিব!"

চট্টো। "কালে যে দেশ উৎসন্ন যাইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই; তবে আজ এ সকল কথা তুলিলেন কেন?"

দত্ত। "দেখুন, এই দুই বৎসর যাবৎ কোন স্থানে কার্য্য ঠিক করিতে পারি নাই, কিন্তু এই মাসের শেষে বিনোদপুর এক মেয়ে দেখিতে গিয়াছিলাম। যেমন ঘর, তেমন বংশ, তেমনই মেয়ে——"

চট্টো। "তবে আর বিলম্ব কি?"

দত্ত। "বিলম্ব আর কিছুই না; শুধু যার বিবাহ দিব, তাহারই আপত্তি।"

চট্টো। "তার আপত্তি! বলেন কি?"

দত্ত। "মহাশয়, দুঃখের কথা বলিব কি; এমন মেয়ে কায়স্থ সমাজে আর পাওয়া যাইবে না। বসন্তপুরের যে মেয়ের কথা আগে বলিলাম, তার চেয়ে শত গুণে শ্রেষ্ঠ। বংশ কায়স্থের চূড়া; অবস্থা ভাল; পিতা ওকালতি করেন; বেশ সঙ্গতি করিয়াছেন। দেনা পাওনার কথা পর্য্যন্ত হইয়াছে। এই মাসের মধ্যেই কার্য্য করিব, আশা দিয়া আসিয়াছি। তাহারা আয়োজন করিতেছে। এদিকে শ্রীমান্ ফিরিয়া বসিয়াছেন!"

চট্টো। "কেন?"

দত্ত। "কেন কিছু না;—পরীক্ষা শেষ না হইলে বিবাহ করিবেন না। ডাক্তারি পড়েন, পরীক্ষার আরও দুবৎসর বাকী আছে। পরীক্ষায় পাশ হইয়া বিবাহ করিবেন!"

চট্টো। "আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?"

দত্ত। "বিনোদপুর হইতে আসিয়াই কলিকাতা চিঠি লিখি, যাদবের কাছে। চিঠির উত্তরে যাদব—যাদব প্রবোধের মামাতত

ভাই—লিখিয়াছিল ;—'পরীক্ষা না হইয়া গেলে দাদার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই।' চিঠি পাইয়া অবাক্ ; পুনরায় চিঠি লিখিলাম ; নীরদাকে দিয়াও লেখাইলাম ;——সেই উত্তর! এ দিকে আমি এক ভদ্রলোককে আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছি ; তাহারা অন্য চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়াছে। বলুন্ দেখি, এমন অবস্থায় কে স্থির থাকিতে পারে ?"

চট্টো। "ছেলের কাছে ভাল করিয়া সকল কথা লিখুন, সে তো আর অবোধ—গোঁয়ার নয় ; অবশ্যই আপনার কথা রাখিবে।"

দত্ত। "আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এ বিবাহ না দিয়া ছাড়িব না। আমার পিতা যে আমার বিবাহ দিয়াছিলেন, তার জন্য কি আমার অভিপ্রায় জানিতে চাহিয়াছিলেন ?—তিন যুগ পিতা মাতা ছেলে মেয়ের বিবাহ দিয়া আসিয়াছে, এখন কি মা বাপ ছেলে মেয়ের পর হইয়াছে নাকি যে, ছেলে মেয়ের কাছে অনুমতিপত্র না পাইলে, বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে পারিবে না ?—জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াই মাটি খাইয়াছি। আরও একবার লিখিয়া দেখিব ; সম্মত হয়, ভাল ; না হয়, মেয়ে তুলিয়া বাড়ীতে আনিব ; দেখিব, কেমন করিয়া বিবাহ না করে।"

চট্টো। "আপনি অত আশঙ্কা করিতেছেন কেন ? প্রবোধ অবশ্যই আপনার কথা শুনিবে। নীরদাকে দিয়া আর একখানি চিঠি লেখান। সুন্দরী মেয়ে, সদ্বংশ—আপত্তির হেতু কি ?"

দত্তমহাশয় এইরূপ যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম এবং বাক্‌বিতণ্ডার পর পুত্রের শুভ বিবাহসম্বন্ধ সুস্থির করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফাল্গুন মাস। বাঙ্গালা দেশের রাজধানীতে বসন্তের পদার্পণ হয় কিনা, বলিতে পারি না; কিন্তু কোন কোন পল্লীগ্রামে এই ঘোর কলিতেও বসন্তের আবির্ভাব দেখা যায়। কালমাহাত্ম্যে সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর স্বাভাবিক শোভার ক্রটী ছিল না; তাহার উপর আবার বাড়ীতে শুভ কার্য্যোপলক্ষে বিচিত্র সাজসজ্জা!

বিনোদপুরে আশুতোষ মিত্রের বাড়ীতে আজ বৃহৎ ব্যাপার; একমাত্র কন্যা বাসন্তীর বিবাহ। আশুবাবু নিজে বিশেষ বিজ্ঞ লোক, বিশেষতঃ পাত্রকর্ত্তা ত্রিলোচন দত্ত মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুসারে অনেক অনেক বিজ্ঞ জ্যোতিষীর নির্দ্ধারিত শুভ দিন, শুভ লগ্ন দেখিয়া বড় স্নেহের কন্যা বাসন্তীর বিবাহের আয়োজন করিয়াছেন। পাত্রীর সৌভাগ্যে উত্তম পাত্র মিলিয়াছে। শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র দত্ত প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কালেজে পাঠ করিতেছেন। ত্রিলোচন দত্তের বিষয় সম্পত্তি প্রচুর। আর পুত্র নাই। সন্তানের মধ্যে আর একটী কন্যা,—বিধবা নীরদা। পরীক্ষাসমাপ্তির-পূর্ব্বে প্রবোধের বিবাহ করিবার অভিপ্রায় ছিল না; শেষে পিতার নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া স্বীকার হইয়াছেন।

বিবাহে দত্ত পরিবারের আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। মিত্রমহাশয় পরম যত্নে সকলের অভ্যর্থনা করিয়াছেন। দূর হইতে মিত্র-পরিবারের আত্মীয় কুটুম্বেরাও আসিয়াছেন। কুটুম্বিনীর সংখ্যাই অধিক। বিবাহ মিত্রবাড়ীতে, কিন্তু ঋণের দায়ে ঠেকিয়াছেন ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, গুহ অনেকে। নূতন গহনা, নূতন বোম্বাই

সাড়ী, বানারসী সাড়া, না হইলে অনেকের নিমন্ত্রণ এবং সম্ভ্রম একত্র রক্ষা করা কঠিন!

নহবৎ বাজিতেছে। দ্বারে পূর্ণ কুম্ভ, তাহাতে আমের পল্লব আর অপক্ক নারিকেল। উঠানে আলিপনা, আকাশে পতাকা; বড় ঘটা। বাড়ীর ছেলে পেলে; পাড়ার ছেলে পেলে, সকলে একত্র হইয়াছে। ফুল-মালার ছড়াছড়ি। আতর, গোলাপ এবং বিলাতি এসেন্সের গন্ধে চারিদিক ভরপূর।

লগ্ন উপস্থিত। বর বিবাহ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াছেন। চারিদিকে মঙ্গল হুলুধ্বনি, বরদর্শনলোলুপা কুটুম্বিনী সমাজের দ্রুতগতিজনিত অলঙ্কারধ্বনি, জাতীয়, বিজাতীয় নানা জাতি বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলোৎপন্ন বিপুল বিকট ধ্বনি,—একত্রে মিত্রবাড়ী কোলাহলময় করিয়া তুলিয়াছে। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করাইতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় এক বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইল।

পাত্র বিবাহ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই দত্তমহাশয় যৌতুকের সামগ্রী এবং পাত্রীর অলঙ্কার পত্রের তালিকা দেখিতে চাহিয়াছিলেন। দত্তমহাশয় কৃতকর্ম্মা লোক; সম্বন্ধের সময় যে মূল্য এবং যে ওজনের যে যে জিনিসপত্র দেওয়ার কথা হইয়াছিল, তদনুরূপ জিনিসপত্র দেওয়া হইল কি না, শুভকর্ম্ম শেষ হইবার পূর্ব্বে তাহা নিশ্চয় না জানিয়া কার্য্য শেষ হইতে দিবার লোক নহেন। কিন্তু তালিকা দেখিয়া প্রথমেই ভয়ানক অপ্রসন্ন হইলেন।

পাত্রকে হীরার আংটী দিবার কথা ছিল। হীরার আংটী পঞ্চাশ টাকায়ও পাওয়া যায়, তিন শত টাকায়ও পাওয়া যায়। হাজার বার শত টাকা মূল্যের আংটী দত্তমহাশয় আশা করিয়াছিলেন না বটে, কিন্তু এ কি এ? তালিকায় পঞ্চাশ টাকা মূল্যের আংটীর কথা লেখা!

আশুতোষ মিত্র যে এত কম মূল্যের জিনিস দিবেন, তাহা তো দত্তমহাশয়ের স্বপ্নের অগোচর! তার পর মেয়ের অলঙ্কার। পঞ্চাশ ভরি সোণা আর দুই শত ভরি রূপার অলঙ্কার দেওয়ার কথা। আশুতোষ মিত্র স্পষ্ট স্বীকার না হইলেও সম্পূর্ণ অস্বীকার তো হইয়াছিলেন না। তার মধ্যে সোণা মোটে পঁয়তাল্লিশ ভরি,—রূপা পৌনে দুই শত ভরি! কেন, প্রবোধ কি জলে ভাসাইয়া দিবার ছেলে? ছেলের বাজার কি এতই সস্তা? তখন ভয়ানক গোল বাধিল।

দত্তমহাশয় আশুতোষ মিত্রকে ডাকাইলেন। এ কেমন ব্যবহার? পঞ্চাশ ভরি সোণা যে দিতে না পারে, সে কেন দত্তমহাশয়ের ছেলের সঙ্গে মেয়ের সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিল? ভদ্রসমাজে এ কি জুয়াচুরি! আশুতোষ মিত্র গলবস্ত্র জোড়হস্তে দুই মাসকাল সময় চাহিলেন। দুমাস মধ্যেই তিনি দত্তমহাশয়ের ইচ্ছানুরূপ মেয়ের বাকী অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিবেন। বিবাহ উপলক্ষে অনেক খরচপত্র হইতেছে; অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত আয়োজন করিতে হইয়াছে; এই জন্য এখন আর পারিয়া উঠেন নাই। একমাত্র সন্তান—বাসন্তী; তাহাকে দিবেন, না তো আর কাহাকে দিবেন?

দত্তমহাশয় বলিলেন;—কলিকালে লোকের মুখের কথায় কে বিশ্বাস করে। আজ বিবাহ হইয়া গেলে, শেষে যদি আশুতোষ মিত্র প্রাপ্য অলঙ্কার না দেন, তখন কি হইবে? জামিন কে হইবে? বিবাহের পূর্ব্বে আশুতোষ মিত্র দেড় শত টাকার এক তমঃসুক লিখিয়া দিন; যখন মেয়ের বাকী অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিবেন, তখন তমঃসুক ফেরত লইবেন।

আশুতোষ মিত্র অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে, রাত্রিকালে, এই অল্প সময়ের মধ্যে কোথায় ষ্টাম্প কাগজ পাওয়া যাইবে?

কেমন করিয়া দলিল লেখা পড়া হইবে? অবিশ্বাসের কি হেতু? দত্তমহাশয় কালেজে লেখা পড়া শিখিয়া জুয়াচুরি শিক্ষা করেন নাই। তাঁহার যেমন কথা, তেমন কার্য্য। ঘোর কলিকাল; ধর্ম্ম গিয়াছে, শাস্ত্র গিয়াছে; এখন কি আর লোকের আচার ব্যবহারে, কি কথায় বিশ্বাস করা যায়?

উপস্থিত এক জন ভদ্রলোক বলিলেন;—

"কালেজে পড়ার কি দোষ, দত্তমহাশয়?"

দত্ত। "ধর্ম্ম গেল, কর্ম্ম গেল, আচার ব্যবহার,—সমাজের শাসন সকল গেল;—তবুও দোষ কি?—কলিকাল, না হইবে কি?"

ভদ্র। "কলিকালে কি সকল শ্রেণীর লোকেরই অসুবিধা হইয়াছে, মহাশয়?"

দত্ত। "কাহার হয় নাই?"

ভদ্র। "কেন, এই তো কায়স্থবংশের শ্রেষ্ঠ কুলীন আশুবাবু আপনার পুত্রের সঙ্গে কার্য্য করিতেছেন। যৌতুক, অলঙ্কার পত্র, নগদ কি না দিতেছেন? তবুও আপনার মন উঠিতেছে না। আপনার পিতা পিতামহ কি কোন দিন বিনোদপুরের মিত্র-বংশে কার্য্যের উল্লেখ করিবার সাহস পাইতেন? যাহাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতে মিত্র মহাশয়েরা অপমান বোধ করিতেন, তাহাদের সঙ্গেই আজ যৌতুক-পত্র দিয়া আশুবাবু কার্য্য করিতেছেন!—কলিকালে অনেক লোকের সুবিধাও হইয়াছে, দত্ত মহাশয়।"

মর্ম্মভেদী কথায়,—ক্রোধে, অপমানে দত্তমহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন;—

"কে রে তুই—?—যাদব, মধুখুড়ো বিপিন, (দত্ত মহাশয় ক্রোধে দণ্ডায়মান হইলেন।)—কালীবাবু, ওঠ, ওঠ; আমি ছেলের বিবাহ

দিব না। আমার অপমান! আশু মিত্র আমাকে নিজ বাড়ীতে আনিয়া অপমান করিল! এতদূর সাহস!"

যাদব, মধুখুড়ো, বিপিন, কালীবাবু, রামবাবু শ্যামবাবু;—সভাস্থ সকলে উঠিয়া পড়িলেন। মহা গণ্ডগোল, কোলাহল উপস্থিত হইল।

আশুতোষ মিত্র দত্তমহাশয়ের পায়ে পড়িলেন।—তাঁহার কি অপরাধ? অন্য লোকের কথায় তাঁহার প্রতি নিগ্রহ কেন? কেন রাগ করিয়া তাঁহার জাতিনাশ করিবেন?—দত্তমহাশয় সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

"ওরে গোপাল, ও রামা, প্রবোধকে ডাক্। আমি এখনই বাড়ী রওয়ানা হইব" এই বলিয়া দত্তমহাশয় সে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বাহিরে আসিয়া নিজের আত্মীয় পরিজন ও ভৃত্যবর্গকে ডাকিয়া একত্রিত করিলেন। এখনই বাড়ী যাত্রা করিবেন। বিবাহ-মণ্ডপ হইতে প্রবোধকে বাহির করিয়া আনিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তথায় প্রবেশ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। লোকজন, আত্মীয়কুটুম্ব, ভৃত্য, বাদ্যকর, অতিথিঅভ্যাগত—সকলের দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটিতে মহা এক হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

আশুতোষ মিত্র কোন মতে দত্তমহাশয়ের উদ্দীপ্ত ক্রোধাগ্নি প্রশমিত করিতে পারিলেন না।

এদিকে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করাইতেছিলেন। সেখানে এই গোল-যোগের শব্দ প্রবেশ করিল। বাদ্যবাজনা, হুলুধ্বনি সকল থামিয়া গেল। গোপাল চাকর আসিয়া প্রবোধকে গোলযোগের হেতু জানাইল। শুনিয়া প্রবোধ স্তম্ভিত হইলেন। তখন মন্ত্রপাঠ ছাড়িয়া কেমন করিয়া উঠিবেন?

দত্তমহাশয় ভিতর বাড়ী হইতে প্রবোধকে বাহির করিয়া আনিতে

পারিলেন না। তখন সহস্রস্ত্রীপুরুষসমাকীর্ণ সেই পুরীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া দত্তমহাশয় উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন ;—"আমার পুত্রের বিবাহ আমি বিনোদপুরে দিব না। হাড়ি বাগ্‌দীর মেয়ের সঙ্গে আমি কার্য্য করিব না। আমার প্রতিজ্ঞা, সকলে শোন, বিনোদপুরের মিত্রবংশের কোন মেয়ে আমার বাড়ীতে গেলে আমি তাহাকে ঝাঁটা মারিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইব।"

তখন সদলবলে দত্তমহাশয় মিত্রবাড়ী হইতে বাহির হইলেন। আশুতোষ মিত্র নিজ আত্মীয় কুটুম্ব সঙ্গে লইয়া দত্তমহাশয়ের সাধ্য সাধনা করিতে করিতে গ্রামের বহির্ভাগ পর্য্যন্ত আসিলেন ; কিন্তু তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না।

সেই আনন্দের দিনে মিত্রবাড়ী নিরানন্দ হইয়া উঠিল। কোথায় সেই আমোদ প্রমোদ, উৎসাহ উদ্যম ?—সকলে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হইলেন।

এইরূপে বাসন্তীর বিবাহ হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিনোদপুর হইতে কুসুমহাটী দশ মাইল। সেই রাত্রিতেই ত্রিলোচন দত্ত মহাশয় বাড়ীতে পৌঁছিলেন। বাড়ীর লোকজন চমকিত। নববধূ গৃহে আসিবে, নহবৎ বাজিবে, হুলুধ্বনি পড়িবে; কত কি আমোদ হইবে; কিছুই না। দত্তমহাশয় বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন না। পুরস্ত্রীগণ অন্যান্য লোকের মুখে প্রকৃত কথা শুনিয়া আনন্দের দিনে ম্রিয়মাণ হইলেন।

পরদিন গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"প্রবোধের বিবাহ দিয়া আসিলে, বৌ কোথায়? প্রবোধ কোথায়?"

কর্ত্তা উত্তর করিলেন;—

"আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না; আমি ছেলের বিবাহ দি নাই।"

গৃহিণী। "সে কি কথা! সকলেই বলিতেছে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

কর্ত্তা। "হইয়া থাকিলেও হয় নাই; সেই ছোট লোকের মেয়েকে আমি বৌ বলিয়া ঘরে আনিব না।"

গৃহিণী। "আমার এক ছেলে, বৌ ঘরে আনিব না?"

কর্ত্তা। "আমি এক মাসের মধ্যে ছেলের আবার বিবাহ দিব।"

গৃহিণী। "তোমার কথা শুনিয়া গা কাঁপে। কাল এক বিবাহ দিলে; আজই তুমি বলিতেছ, ছেলের আবার বিবাহ দিবে! কেন, হইয়াছে কি?"

কর্ত্তা। "যা হইবার হইয়াছে; আমি এ বৌ ঘরে আনিব না। ছোটলোকের কথা সহ্য হয় না। আবার ছেলের বিবাহ দিব।"

গৃহিণী। "আর এ বৌ জলে ভেসে যাক্?"

কর্ত্তা। "জলেই ভেসে যাক্, আর আগুনেই পুড়ে মরুক, এ আমার পুত্রবধূ নহে।"

গৃহিণী। "তোমার পুত্রবধূ কেন হইবে; বাগ্‌দীদের পুত্রবধূ! শোন, আজ বিকালেই প্রবোধ বৌ লইয়া আসিবে; আমি বরণ করিয়া পুত্র ও বধূ ঘরে লইব।"

পরিণামে গৃহিণী পরাজিত হইলেন। ত্রিলোচন দত্ত বাহিরে আসিয়া বলিলেন;—

"বাড়ীর লোকজন, শোন, প্রবোধের বিবাহ হয় নাই। আজ যদি কোন ছোট লোকের মেয়ে বৌ সাজিয়া আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে আসে, তাহাকে প্রবেশ করিতে দিবে না। আমার বাড়ীর যে কোন লোক আমার এই আজ্ঞার বিপরীত আচরণ করিবে, সে তখনই আমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইবে। বাহিরের দরজা বন্ধ কর।"

বাড়ীর নহবৎ, বাদ্যবাজনা, অতিরিক্ত চাকর, কুটুম্ব, সকল বিদায় হইল। কলার গাছ, মঙ্গলকলসী, ফুলপাতার মালা, চিত্র বিচিত্র পতাকা—সকল বিদূরিত হইল। বাড়ীর ছেলেরা গায়ের পোষাক, মেয়েরা অলঙ্কারপত্র সকল রাখিয়া দিল। সেই হাস্যবাদ্যোদ্যম-পরিপূর্ণ পুরী হঠাৎ নীরব নিরানন্দ হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। প্রবল ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ দেখা দিল। এমন সময় তিন চারি খানি পাল্কী এবং আরও ৮।১০ জন লোক দত্ত বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাড়ীর দরজা বন্ধ। কিন্তু বাড়ীর সকলেই জানিতে পারিল যে প্রবোধ সস্ত্রীক গৃহে আসিয়াছে। তখন দাস দাসী, ছেলে মেয়ে সকলে দৌড়িয়া বাহিরের দরজার কাছে গেল। নূতন বৌ আসিতেছে, কর্ত্তার আদেশ

কে মানে ? তখন আরক্তচক্ষু-কম্পিতকলেবর ত্রিলোচন দত্তমহাশয় বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া দরজার কাছে গেলেন। তাঁহার আরক্তচক্ষু দেখিয়া অনেকে ছুটিয়া পলাইল। দত্তমহাশয় দরজা খুলিয়া প্রবোধকে ডাকিলেন। প্রবোধ পাল্কী হইতে নামিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। তখন দত্তমহাশয় উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন ;—

"আর কেহ আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদি কেহ আমার অমতে এ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চায়, লাঠির আঘাতে তাহাকে দূর করিয়া দিব। কোন হাড়ি বাগ্দীর মেয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

এই বলিয়া দত্তমহাশয় নিজ হস্তে দরজা বন্ধ করিয়া কুলুপ আঁটিয়া পুনরায় বৈঠকখানায় আসিলেন। এ দিকে প্রবলবেগে ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত আরম্ভ হইল। বাহির হইতে লোকের কাতরোক্তি, অনুনয় শব্দ এবং অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনা গেল ; বৃষ্টির জলে বাহিরের লোক ভিজিতে লাগিল ; কিন্তু কিছুতেই কর্ত্তার মন ভিজিল না।

নববধূর মাতুলও সঙ্গে আসিয়াছিলেন। গৃহে প্রবেশের অথবা বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া, অবশেষে সেই ভয়ানক বৃষ্টি দুর্য্যোগের মধ্যে নিরুপায় পাত্রীপক্ষগণ পাল্কী তুলিয়া রওয়ানা হইল। তখন ঘোর অন্ধকার হইয়াছে, পথ দৃষ্ট হয় না। বাহকগণ বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিল।

দত্তবাড়ীর কিছু দূরেই এক ব্রাহ্মণবাড়ী ছিল : সেই বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া বাহকগণ চলিতে একেবারে অস্বীকার করিল। মাতুল মহাশয় নিরুপায় হইয়া ভাগিনেয়ীকে লইয়া সেই বাড়ীতে আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। ব্রাহ্মণ ঠাকুর দুর্য্যোগের গতিকে দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন। আগন্তুকদিগের কাতরোক্তিতে দরজা খুলিয়া দাসীসহ মেয়েটীকে ভিতরে

পাঠাইয়া দিলেন; স্বয়ং অন্যান্য লোকের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

সেই রাত্রি নয়টার পর নীরদা আর্দ্রবস্ত্রে মাতার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল গৃহিণী একাকিনী শয্যায় পড়িয়া নীরবে কাঁদিতেছেন।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"নীরু, ভিজিলি কেমন করিয়া"?

নীরদা। "বৌ দেখিতে গিয়াছিলাম।"

মাতা। "বৌ দেখিতে! কোথায় বৌ?"

নীরদা। "যে ঝড় বৃষ্টি! তাহারা অনেক দূর যাইতে পারে নাই। বামণবাড়ীতে আছে। শ্যামার কাছে শুনিয়া তাহাকে লইয়া গোপনে বামণবাড়ী গিয়াছিলাম। এমন সুন্দর বৌ, মা, যেন অপ্সরী! আমরা এমন বৌ ঘরে আনিতে পারিলাম না!"

মাতা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িলেন, বলিলেন;—

"কেমন দেখিলি, বল্; বৌ তোর সঙ্গে কথা বলিল?"

নীরদা। "কথা বলিবে কি? কাঁদিয়াই আকুল। তা, মা, বৌর দোষ কি? বৌ তো কিছু করে নাই; আমরা বৌ লইয়া আসি না কেন? এমন বৌ আর পাইব না। চাঁপার মত রঙ্গ, মাথায় অমন চুল, অমন পটলচেরা চোক!—মা, আমার প্রাণের মধ্যে যেন কেমন করিতেছে।"

মায়ের চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল, তিনি বলিলেন;—

"তুই কাপড় ছাড় গিয়ে, নীরু; আমি আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

গৃহিণীর চেষ্টায় ফল হইল না। বৌ আনা হইল না। দত্তমহাশয়ের অটল প্রতিজ্ঞা। কাহার সাধ্য বৌ ঘরে আনে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তাহার পর তিন চারি বৎসর চলিয়া গেল। দত্তমহাশয় প্রবোধ-চন্দ্রের পুনরায় বিবাহ দিবার অনেক চেষ্টা করিলেন। প্রবোধ কোন প্রকারেই পিতার প্রস্তাবে স্বীকার হইল না। প্রথমবারও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্ব্বে বিবাহে প্রবোধের অমত ছিল; কিন্তু শেষে পিতা, মাতা, ভগ্নীর নিতান্ত আগ্রহে বিবাহ করিয়াছিলেন। এবার কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। পিতা অনুনয়, বিনয়, রাগ, নিগ্রহ অনেক প্রদর্শন করিলেন; প্রবোধ কোন মতেই স্বীকার করিলেন না। নীরদা পিতাকে জানাইয়াছিল যে, বধূকে গৃহে আনিলে প্রবোধ সংসার করিবে; নতুবা সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবে না; গৃহ সংসারে তাহার স্পৃহা নাই।

কিন্তু দত্তমহাশয় বিনোদপুরের বধূকে গৃহে আনিতে অস্বীকার হইলেন। প্রবোধ মেডিক্যাল কালেজের পাঠ শেষ করিয়া চিকিৎসকের ব্যবসা আরম্ভ করিল।

এদিকে মিত্রপরিবারের অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। কন্যা শ্বশুরগৃহে স্থান না পাইয়া বাড়ীতে প্রত্যাগত হওয়ার পর হইতে নানা চিন্তায়, মনোকষ্টে আশুতোষ মিত্রের শরীর ক্রমে অসুস্থ হইতে লাগিল। তিনি স্বয়ং কুসুমহাটী দত্তবাড়ীতে আসিয়া অপরাধ স্বীকার এবং অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন ফল হইল না। দত্তমহাশয়ের অভিমান কিছুতেই গেল না; তাঁহার ক্রোধ কিছুতেই প্রশমিত হইল না।

বাসন্তীর বিবাহের দুই বৎসর পরে তাহার পিতার মৃত্যু হইল। বিধবা মাতা কন্যা লইয়া বিপদসমুদ্রে পড়িলেন। সোণার জামাতা,

স্বচ্ছল ঘর, শ্বশুরের অন্নে কত লোক প্রতিপালিত; কিন্তু অভাগিনী বাসন্তীর গ্রাসাচ্ছাদন চলা কষ্টকর হইয়া উঠিল। আশুতোষ মিত্রের ভূমি সম্পত্তি কিছুই ছিল না। চাকরীদ্বারা সংসার চালাইতেন। এমন অবস্থার লোকের অভাবে সংসারে যে দশা ঘটিয়া থাকে, মিত্রবাড়ীর অবস্থাও সেইরূপ হইল। বাসন্তী ও তাহার মাতার দিনপাত অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিল। বাসন্তী আপনার গহনাগুলি দুই এক করিয়া বিক্রয় আরম্ভ করিল।

বিবাহের তিন চারি বৎসর পরে একদিন কোন আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে নীরদা বিনোদপুরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে গিয়াছিল। সেখানে অনেক পরিচিতা, অপরিচিতা স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। কিন্তু তাহার মধ্যে একজনকে দেখিয়া নীরদার চিত্ত স্বতঃই আকৃষ্ট হইল। তাহার বয়স ষোড়শ বর্ষের অতিরিক্ত হইবে না। প্রায় সম্পূর্ণ নিরাভরণা—হাতে দুগাছি বালা, কাণে দুগাছি মাকড়ীমাত্র। পরিধানে একখানি সামান্য সাড়ী; মস্তকে আষাঢ়ের নবীন মেঘের ন্যায় কাল, দীর্ঘ কেশরাশি—কিন্তু তাহাতে যত্ন কি আদরের কোন চিহ্ন নাই। সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দু। যুবতীর সর্ব্ব শরীর লাবণ্যময়; কিন্তু সে লাবণ্য কেমন যেন বিষাদে মাথা। মুখে হাসি নাই। কিন্তু সেই প্রশান্ত বিষাদপূর্ণ চক্ষু বড় মধুর, বড়ই চিত্তদ্রবকারী। যুবতী সেই বহু পুরস্ত্রী মধ্যে সর্ব্বদা কার্য্যে—পর-পরিচর্য্যায় নিযুক্তা। দেখিয়া নীরদার চিত্ত অধিকতর কৌতূহলময় হইল। তখন একবার বাড়ীর গৃহিণীর কাছে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। গৃহিণী চমকিতের ন্যায় বলিলেন;—

"চিনিলি না? ও যে তোদের বৌ—বাসন্তী! কাল এখানে আসিয়াছে।"

নীরদা বিধবা; দিনান্তে হবিষ্য করিতে যাইতেছিল, গেল না। বাসন্তীর কাছে গেল। বাসন্তী এক কোণে দাঁড়াইয়া ছিল; নীরদা কাছে যাইয়া প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি হইল। বাসন্তী বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল;—

"তুমি কে গা?"

নীরদার চোকে জল আসিয়াছিল; আঁচলে চক্ষু মুছিয়া বলিল;—"কপাল মন্দ, বৌ, তাই আজ পরিচয় দিতে হইল।—আমি নীরদা, তোমার ননদ, তোমার বোন্।" বাসন্তীর চক্ষুও জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল; কথা ফুটিল না।

নীরদা তখন কম্পিতকলেবরা ভ্রাতৃবধূর হাত দুহাতে ধরিয়া অপর এক নির্জ্জন গৃহে লইয়া গেল। সেখানে দুজনে অনেক কথা হইল। সম্পর্ক পুরাতন, কিন্তু পরিচয় নূতন; আলাপ নূতন। নীরব ক্রন্দনে দুজনের চক্ষু, গণ্ড, বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল।

নীরদা বলিল;—"আমরা তোমার কাছে সহস্র অপরাধী; কিন্তু ঈশ্বর জানেন, তোমাকে ছাড়িয়া আমরা কি ভাবে আছি।"

বাসন্তী। "তোমরা অপরাধী?—আমি শত জন্মের পাপী! এ পাপমুখ মানুষকে দেখাইতে সাহস হয় না। আমার অদৃষ্টের দুঃখ; তোমাদের কি অপরাধ?—ঠাকরুণ ভাল আছেন? ঠাকুর ভাল আছেন? আর—আর তোমরা সকলেই ভাল আছ তো?"

নীরদা। "ভাল আছি বৈকি; হাসি, খেলি; খাই, বেড়াই! আমাদের ভাগ্য মন্দ, তোমাকে ঘরে নিতে পারিলাম না। আমাদের সোণার সংসার ছারখারে গেল।"

বাসন্তী। "আমি অভাগিনী, আমার জন্ত তোমরা সংসার নষ্ট করিলে কেন?"

নীরদা। "দাদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আর বিবাহ করিবেন না। বাবা কত চেষ্টা করিয়াছেন, দাদা স্বীকার হন নাই।—যদি কখনও তোমার কুসুমহাটী যাওয়া হয়, তবে তিনি সংসার করিবেন; নতুবা—"

বাসন্তী। "নতুবা?"

নীরদা। "নতুবা দাদা আর সংসার করিবেন না।"

বাসন্তীর সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইল। হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে কণ্ঠ আবদ্ধ হইয়া উঠিল। চক্ষু প্রবল-প্রবহমান অশ্রুভারবিস্ফারিত, শেষে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। ক্ষণকালপরে বাসন্তী বলিল;—

"আমি কে? দেখা নাই; শুনা নাই, একদিনের আলাপ নাই; আমার জন্য কেন তোমরা সোণার ঘর মাটি করিবে? কত সুন্দরী, কত ভাগ্যবতী কত স্থানে আছে, দেখিয়া শুনিয়া তোমরা সংসার পাতিয়া দাও।"

নীরদা। "আর তুমি?"

বাসন্তী। "দেবতা আছেন, ঈশ্বর আছেন। আমি ত পায়ের ছাড়া ধুলা; কে আমি?"

নীরদা। "তা হবে না, বৌ; দেবতা আছেন, ঈশ্বর আছেন; কি অপরাধে তোমার এ শাস্তি?"

বাসন্তী। "সহস্র পাপ করিয়াছিলাম—পাপিষ্ঠা আমি, তাই—"

নীরদা। "ঈশ্বর যা করেন, হইবে; আমরা তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। দাদা দিবারাত্র বিমর্ষ; মা দিনরাত কাঁদেন; সংসার ডুবে গেল।—আমি চারি দিনের মধ্যে, বৌ, তোমাকে বাড়ীতে নেওয়াইব।"

বাসন্তী। "আর তোমার বাবা?"

নীরদা। "যেমন করিয়া পারি, তাঁহাকে স্বীকার করাইব। সেই

বিবাহের পর দিবস ঝড়বৃষ্টির সময় তোমাকে দেখিয়াছিলাম ; আজ ক বছর আর দেখা নাই। কেবল লোকের মুখে তোমার কথা শুনিয়া দাদার কাছে আলাপ করি ;—আর, দাদার চক্ষু ভাসিয়া জল পড়ে ! আজ তোমাকে দেখিলাম ; আর তোমাকে ছাড়িতে পারিব না। বাবা গত কল্য বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছেন ; দুই মাসের মধ্যে তাঁহার ফিরিয়া আসার সম্ভব নাই। তোমাকে আমরা বাড়ীতে লইয়া যাইব। তিনি ফিরিয়া আসিয়া আর কি করিবেন ?”

এই বলিয়া বাসন্তীর গলা ধরিয়া সেই গলদশ্রুপরিপ্লাবিত মুখ নীরদা নিজের বক্ষস্থলে স্থাপিত করিল।

সে দিন আর কাহারও অন্নাহার হইল না। সন্ধ্যার পর গৃহিণীর আগ্রহে সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া সেই বিবাহোচিত কোলাহলময় বাড়ীতে, বধূ আর ননদ এক নির্জ্জন গৃহে এক শয্যায় শয়ন করিয়া, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তার পর সুষুপ্তি লাভ করিল।

পরদিন উভয়ে নিজ নিজ পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নীরদা বাড়ীতে আসিয়া আর গৌণ করিল না। বাসন্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার সংবাদ বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া মাতাকে বলিল ;—

"আর কত বলিব, মা! বৌ আমাদের সোণার প্রতিমা ;—বৌকে বাড়ীতে আনাইতে হইবে।"

মাতা। "আমার কি কোন দিন তাহাতে অসাধ? আমার প্রবোধের বৌ, আমি ঘরে আনিতে পারিলাম না ; আমার দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে? আজ তিন চারি বৎসর কত চেষ্টা করিলাম, কোন মতেই তো পারিলাম না।"

নীরদা। "মা, বাবা এখন বাড়ীতে নাই, শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়াও আসিতেছেন না। আমরা কালই বৌ লইয়া আসি। একবার আনিয়া ফেলিলে বাবা আর কি করিবেন?"

মাতার চক্ষু বিস্ফারিত হইল। আজ তিনি প্রৌঢ়া বয়সের গৃহিণী ; কিন্তু দশ বৎসর বয়সে যখন বধূবেশে এ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত স্বামীর প্রকাশ্য অনভিমতে কখনও কোন কাজ করেন নাই। আজ নীরদার কথায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন ;—

"তুই রকম জানিস্ না, তাই অত সাহস করিস্।"

নীরদা। "তোমার একবিন্দু সাহসও নাই, মা।"

মাতা। "আজ আমরা বৌ লইয়া আসি, আর কাল তিনি বাড়ী আসিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলকে তাড়াইয়া দিবেন।"

নীরদা। "ক্ষতি কি? এ ঘর বাড়ী দিয়াই বা কি করিবে? দাদা সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবে, ঘর সংসার ছারখারে যাইবে, আর আমরা সাহস করিয়া বৌ আনিতে পারিব না?"

মাতা। "বিবাহের রাত থিকে চটিয়া আছেন, আজ পর্য্যন্তও সে রাগ পড়িল না!"

নীরদা। "বৌর কি দোষ?—যে বৌকে চিনে, সে গ্রাম হইতে যে লোক আসে, তাহার মুখেই তো বৌর রূপ গুণের প্রশংসা, তাহার মুখেই তো বৌর সুখ্যাতি শুনি। অপরাধ করিয়াছে বৌর বাপ মায়, তার মাতুল খুড়োয়, বৌ ফেলে দি আমরা কোন্ দোষে? কাজ কি তোমার ঘর গৃহস্থালী দিয়া? কাহাকে লইয়া ঘর করিবে?—দাদা তো আর বিবাহ করিবেন না।"

মাতা। "নীরু, আমি—আমি—"

নীরদা। "মা, তুমি সাহস কর, আমরা বৌকে আনি; তুমি কোন ভয় করিও না"

কন্যার তেজস্বিনী কথাতে মাতার মন বিচলিত হইল। প্রবোধ সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবে! মায়ের মন মেয়ের কথায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন;—

"যা করেন ভগবান, আমার বুক ফেটে যায়!—প্রবোধকে জিজ্ঞাসা কর্, আর আন্‌বি তো কালই লোকজন পাঠাইয়া দে।"

নীরদা প্রবোধের কাছে ছুটিয়া গেল।

প্রবোধ ডাক্তার হইয়া বাড়ীতে আসিয়াছেন। ইচ্ছা ছিল, কলিকাতা হইতে ব্যবসা করিবার জন্য উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে যাইবেন। কিন্তু পিতার আগ্রহাতিশয্যে বাড়ীতে আসিয়াছেন। বাড়ীতে কিছুদিন থাকিয়া এলাহাবাদ কি আগ্রা যাইবেন। পিতার অভিপ্রায়, এই সময়ের মধ্যে পুনবায় পুত্রের বিবাহ দিবেন। কিন্তু প্রবোধ পুনরায় বিবাহে স্পষ্ট অস্বীকার।

নীরদা। "দাদা, পশ্চিমে কবে যাইবে?"

প্রবোধ। "বোধ হয় আরও দেড় মাস কাল বাড়ীতে আছি। বাবা ফিরিয়া না আসা তক বাড়ীতে থাকিতে হইবে।"

নীরদা। "সে দিন বাবা যে সম্বন্ধের কথা বলিলেন, তাহা কি হইবে না ?"

প্রবোধ। "নীরু, তোকে কতবার বলিব ? আমি আর বিবাহ করিব না—নিশ্চয়। তবুও তোরা কেন আমাকে চিরকাল জ্বালাতন কর্‌বি ? আমি ত বিবাহ করিয়াছি ; আর কেন ?"

নীরদা। "আমি শশীর বিবাহে গিয়াছিলাম, দাদা।"

প্রবোধ। "হাঁ, বিবাহ কেমন হইল ? বর কেমন ?"

নীরদা। "আমি ভাল করিয়া বর দেখি নাই।"

প্রবোধ। "সে কি ? বিবাহে গেলে, আর বর দেখ নাই ?"

নীরদা। "আমি এক বৌ দেখিয়া আসিয়াছি, দাদা !"

প্রবোধ। "বৌ ! কোন্ বৌ ?"

নীরদা। "আমাদের বৌ ; আর কোন্ বৌ, দাদা ?"

প্রবোধ অনিমেষচক্ষে চাহিয়া রহিল। তখন নীরদা সকল কথা খুলিয়া বলিল। বিবাহ বাটীতে বাসন্তীর সহিত সাক্ষাৎ, বাসন্তীর মধুর ব্যবহার,—তাহার হৃদয়বিদারক বাহ্য শান্তি,—অন্তরের অসহ্য ব্যথা—সকল কথা বিস্তারিত করিয়া বলিল। প্রবোধ কাঁদিল না ; কিন্তু তাহার দুই চক্ষু বর্ষাকালের তটপ্রতিঘাতী জলপরিপূর্ণ সরসীবৎ আপন্ন অশ্রুজলোচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠিল।

নীরদা। "অমন সোণার প্রতিমা আমি আর দেখি নাই, দাদা। অমন চোখ, অমন নাক, অমন মুখ, মাথাভরা অমন চুল—আমি আর দেখি নাই, দাদা।"

প্রবোধ সেই ঘরে পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

"—গায়ে একখানি গহনা নাই, ভাল একখানি কাপড় নাই, তবু কি রূপ!"

প্রবোধ বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিল।

"—হায়! হায়! দাদা, এমন বৌ আমরা ঘরে আনিতে পারিলাম না!—এমন বৌ আমরা ঘরে আনিব না?—মুখে উচু কথাটি নাই, মুখ তুলিয়া চাওয়া নাই, মনের দুঃখে সেই সুন্দর চাঁদপানা মুখ দিনরাত মেঘে ঢাকা!"

প্রবোধ। "হা ঈশ্বর!—নীরদা কেন আর সে কথা তুলিস্?"

নীরদা। "তুলিব না?—আমি পাষাণ নই, দাদা। পেটের দুটি অন্নের জন্য বৌ গহনা বেঁচিয়া খায়, আমাদের ঘরের অন্ন খাইবার মানুষ নাই! পরের খাট্‌না খাটিয়া আমাদের বৌর শরীর যায়, আমাদের চাকর চাকরাণীর অভাব নাই!"

প্রবোধ। "নীরু, নীরু——"

নীরদা। "গত বছর বৌকে দেখিয়া আসিয়া শ্যামা কি বলিয়াছিল? অমন বৌ—রূপে বল, গুণে বল, চরিত্রে, ব্যবহারে—অমন কি আর হয়?—দাদা, বাবার কথা বলিব না, কিন্তু তুমি"—নীরদা কাঁদিয়া ফেলিল।—"কিন্তু তুমি পাষাণ, বিধাতা রক্তমাংস দিয়া তোমাকে গড়েন নাই! তাহা না হইলে এমন বৌকে—হায়! হায়! নিরপরাধে এমন বৌকে তুমি—তুমি—পথের কাঙ্গাল করিয়া, জলে ভাসাইয়া দিয়া স্থির আছ, দাদা?"

প্রবোধ। "নীরু, নীরু, থাম্। আমি মানুষ নই; তুই ঠিক বলেছিস্; আমার হৃদয় পাষাণ। আমি——"

নীরদা। "এমন বৌ, দাদা! দশের সঙ্গে মিশিতে হয়, তাই খায় পরে, চলে ফিরে। কিন্তু আমি মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি,

চিত্তের মধ্যে তার কি যাতনা, কি অপার দুঃখ ;—সকল থাকিতে তার কিছুই নাই ! হায়, দাদা, বিনা অপরাধে এমন প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া মন বেঁধে আছ ?”

প্রবোধ। “মন বেঁধে আছি !—নীরু, তুই ছোট বোন্, তোকে আর কি বলিব ?—এ চারি বছর কি আমি সুখে আছি ?”

নীরদা। “দাদা, আমি অবোধ। আমার অপরাধ লইও না। তোমার কষ্ট আমি বুঝি, কেবল মনে মানে না, তাই তোমাকে কটু বলিতেছি।”

তখন অশ্রু মুছিয়া অপেক্ষাকৃত স্থিরভাবে নীরদা বলিল ;—

“আজ যাহা ঠিক করিয়াছি, শুন ;—“মার কাছে বলিয়াছি, কাল বৌকে আনিতে পাঠাইব। তুমি বেহারা, লোকজন ঠিক করিয়া দাও।”

প্রবোধ। “বাবার মত জানিস্ তো ; আজ তোরা কেন এ গোলযোগ উপস্থিত করিস্ ?”

নীরদা। “বাবার মতামত আর আমরা দেখিব না। বৌর কোন দোষ নাই ; এমন বৌ আমরা ছাড়ি কোন্ অপরাধে ? আর তুমিই স্ত্রী পরিত্যাগ করিবে কি বলিয়া ? এ পাপের ভাগী কে হইবে ? আমরা আর কাহারও কথা শুনিব না।”

প্রবোধ। “বাবা আসিয়া কি বলিবেন ? ঘর হইতে যখন বাহির করিয়া দিবেন, তখন তোমরা কি করিবে ?”

নীরদা। “যদি বৌকে তাড়ান, আমরা বাড়ী শুদ্ধ সকলে চলিয়া যাইব।”

প্রবোধ। “আজ কাল ছেলেরা পিতার অবাধ্য হয়, আমিও হইব ?”

নীরদা রাগ করিয়া বলিল ;—

"না, তা হবে কেন? বিবাহ করিয়া নিজের স্ত্রীকে গলায় কলসী বেঁধে জলে ফেলে দাও!"

শেষে নীরদার জয় হইল। পঞ্জিকা দেখা হইল। কাল সকালে লোক পাঠান হইবে; পরশ্ব দিবস বৌ ঘরে আসিবে। অভাগিনী বঙ্গ-বিধবা চিরকাল পরের সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য ব্যস্ত।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিয়মিত দিবসে বাসন্তী শ্বশুরগৃহে পৌঁছিল। কোন আমোদ, উৎসব, কোলাহল কিছুই হইল না। বৌ যে আসিবে, এ কথা দত্তবাড়ীর লোক ভিন্ন গ্রামের আর অতি অল্প লোকেই জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু নীরদা সদর দরজার দুপাশে কলা গাছ পুঁতিয়া জলপূর্ণ কলসী এবং তাহার উপর আমের পল্লব ও নারিকেল স্থাপন করিয়াছিল। আর ভিতর বাড়ীর উঠানের মধ্যভাগে আলিপনা দিয়া, বৌকে বরণ করিয়া লইবার আয়োজন করিয়াছিল। প্রবোধ হাসিয়া বলিয়াছিল ;—

"কি করিস্, নীরু, এতো আর কণে বৌ নয়, যে কোলে করিয় ঘরে লইয়া যাইবি !"

নীরদা দাদার কথায় উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বিবেচনা করিয়াছিল না।

বাসন্তী বাড়ীতে পৌঁছিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। গৃহিণী আহ্লাদে সেই বর্দ্ধমানা বধূর ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন ;—

"মা, তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আসিয়াছ ; আজ হইতে আমার প্রবোধ সংসারী হইবে।"

তারপর শাশুড়ী বধূকে বিগ্রহমন্দিরের নিকট লইয়া গিয়া প্রণাম করাইয়া আনিলেন। সেদিন নিজ হাতে রান্ধিয়া বৌকে খাওয়াইলেন। কত আদর, কত যত্ন—আজ চারি বৎসরের আবদ্ধ স্নেহরাশি একবারে উথলিয়া উঠিয়াছে। বধূর কুন্তলরাশি খুলিয়া পুনরায় বান্ধিয়া দিলেন ; নিজের অলঙ্কারের বাক্স খুলিয়া বাছিয়া বাছিয়া ভাল ভাল অলঙ্কারে বধূকে সাজাইলেন। অবশেষে তাহাকে বহুমূল্য বস্ত্র পরাইয়া, নিজ অঞ্চলে তাহার সুন্দর মুখ পরিমার্জ্জিত করিয়া সীমন্তে অতি যত্নে সিন্দূর পরাইয়া

দিলেন। নীরদা এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। নীরদার মুখে হাসি ধরে না।

সেইদিন হইতে দত্তবাড়ীর শ্রী ফিরিল। বাসন্তী দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া শাশুড়ী ননদের সেবা, গৃহপরিমার্জ্জন, তৈজসপত্রের শৃঙ্খলা, রান্না, পরিবেশন—সকল কাজ করিতে লাগিল। শাশুড়ীকে কোন কাজ করিতে দেয় না, ননদকে জোর করিয়া বসাইয়া রাখে। বাড়ীর ভিতরের দাস দাসী বড় বিপদে পড়িল ; তাহাদের চাকুরীই বা যায় !—বাসন্তী তাহাদের কাজ নিজে করিতে আরম্ভ করিল।

পাঁচ দিন যায়, সাত দিন যায়। প্রতিবেশিনীরা বাসন্তীর রূপ, গুণ, ব্যবহার দেখিয়া মোহিত হইতে লাগিল। বাড়ীর লোকজন দাসদাসী বাসন্তীর অসম্ভব বাধ্য হইয়া উঠিল। ঘর দুয়ার, উঠান পরিষ্কার ফুট্‌ফুটে হইয়া উঠিল। বসন্ত সমাগমে যেমন উদ্যান, বাসন্তীর আগমনে দত্তবাড়ী সেইরূপ অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল। অথচ বাসন্তীর মুখের শব্দ কেহ শুনিতে পায় না ; বাসন্তীকে ছুটোছুটি করিয়া চলিতে কেহ দেখিতে পায় না। সে কাহাকেও কাজ করিতে আদেশ করে না ; অথচ কাজও পড়িয়া থাকে না। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল।

এক দিন নীরদা প্রবোধকে বলিল ;—

"কবে পশ্চিমে যাইবে, দাদা ?"

প্রবোধ। "কেন ?"

নীরদা। "ডাক্তার হইয়া কি ঘরে বসিয়া থাকিবে।"

প্রবোধ। "কেন, অনেক ডাক্তার তো নিজ বাড়ীতে বসিয়াই ব্যবসা করে।"

নীরদা। "দাদা, কেমন বৌ গা ?"

প্রবোধ। "দূর্ লক্ষ্মীছাড়ী, বৌ কি বলে, জানিস্ ?"

নীরদা। "না।"

প্রবোধ। "বৌ রাগ করেছে,—বলে যে, তুই তাহাকে কাজ করিতে দিস্‌নে।"

এমন সময় বাসন্তী সেই ঘরে প্রবেশ করিল এবং মৃদু হাসিয়া বলিল ;—

"বৌ বলে যে, ননদ তার ঘর অধিকার করেছে !"

নীরদা বাসন্তীর পিঠে এক কিল মারিয়া সে ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইল।

কিন্তু এই অকৃত্রিম সুখের মধ্যে কাহারও মনে সম্পূর্ণ শান্তি নাই। কর্ত্তা বাড়ীতে আসিয়া কি আচরণ করেন, তাহা মনে করিয়া সময় সময় গৃহিণী এবং নীরদা আকুল হইতেন। গৃহিণীর সাহস কম ; কিন্তু নীরদা পিতার কন্যা ; পিতার সাহস, পিতার অভিমান পাইয়াছিল। প্রয়োজন হইলে, বধূসম্বন্ধে অনুজ্ঞা অমান্য করিবে বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প করিতে লাগিল।

আর বাসন্তী ?—অদৃষ্টে যা থাকে, হইবে ;—এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিত। কোন দিন সে এত সুখের ভরসা করে নাই ; এত সুখ পাইয়াও ভবিষ্যৎ ভুলিল না। এমন শাশুড়ী, ননদ—এমন স্বামী যদি ছাড়িতে হয়,—যখন এই কথা তাহার মনে উপস্থিত হইত, তখন তাহার চিত্ত চমকিয়া উঠিত।

একদিন গভীর রাত্রিতে স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া বাসন্তী স্বপ্ন দেখিল যে, তাহার শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়াছেন, এবং বধূর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, ক্রোধে অধীর হইয়া, তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবার আজ্ঞা দিতেছেন। স্বপ্ন দেখিয়া বিকলহৃদয়া বাসন্তী জাগিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল। গৃহে আলো ছিল ; স্বামীকে জাগাইল না।

অনিমিষনেত্রে স্বামীর সুখসুপ্ত মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেখিয়া দেখিয়া তাহার চক্ষু দ্রুতসঞ্চারিত অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। বাসন্তী জানিতে পারিল না যে, তাহার চক্ষু হইতে বিগলিত অশ্রুবিন্দু একে একে স্বামীর গণ্ড এবং গলদেশে পতিত হইয়া বিচূর্ণিত হইতে লাগিল। সেই দরবিগলিত-অশ্রুস্পর্শে প্রবোধ জাগরিত হইয়া দেখিল, বাসন্তী অবনত মুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে; তাহার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতেছে; বাসন্তী কাঁদিতেছে। প্রবোধ উঠিয়া বসিয়া আঁচলে তাহার মুখ মুছাইয়া দিল, এবং কান্নার হেতু জানিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল ;—

"তুমি পাগল! স্বপ্ন দেখিয়া অমন কাঁদিতে আছে?"

বাসন্তী। "আমার হৃদয় যেন কেমন করিতেছে। তুমি কি আমায় ছাড়িবে?"

প্রবোধ। "তোমাকে ছাড়িব, বাসন্তী!"

বাসন্তী। "আমার প্রাণের ভিতর যেন কেমন করিতেছে। এমন স্বপ্ন কেন দেখিলাম!"

বাসন্তী দুই হাতে স্বামীর পদধারণ করিয়া তখনই আবার বলিল ;—

"তোমার দাসী আমি,—আমায়—"

প্রবোধ অতি আদরে বাসন্তীকে ধরিয়া তুলিল, তাহার অশ্রুসিক্ত মুখ চুম্বন করিয়া বলিল ;—"আমার প্রাণের প্রাণ তুমি, তোমাকে ছাড়িব!"

বাসন্তী। "আমার ভাঙ্গা কপাল; এত সুখের আশা আমি করি নাই। এত সুখ কি আমার অদৃষ্টে সহিবে?"

প্রবোধ। "ঈশ্বর করুণার সাগর, তাই তোমার মত অমূল্য নিধি আমাকে দিয়াছেন। তুমি আমার সর্ব্বস্ব।"

বাসন্তী। "তোমার চরণের দাসী আমি। দেখিও,—প্রভাতের

স্বপ্ন, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে। আবার কি তোমাকে হারাইব ?—অভাগিনীকে ছাড়িও না।"

প্রবোধ। "তোমাকে যে দিন ছাড়িব, সে দিন সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইব। তোমাকেই যদি কাছে না রাখিতে পারিলাম, তবে এ ঘর বাড়ী সংসার দিয়া আমি কি করিব ?"

তখন প্রবোধ আঁচলে পুনরায় বাসন্তীর অশ্রুসিক্ত মুখ মুছাইয়া দিল এবং তাহার আরক্ত অধর পরিচুম্বিত করিয়া বলিল ;—

"তুমি পাগল, স্বপ্ন কি সত্য হয় ? দিনরাত তুমি নানা চিন্তা কর, তাই ও রকম স্বপ্ন দেখিয়াছ। ও কিছু না। ছি ! তুমি ছেলে মানুষ ? রাত শেষ হইয়া আসিতেছে, আর একটুকু ঘুমাও।"

স্বামীর আশ্বাসে—সোহাগে বাসন্তীর উদ্বেলিত আশঙ্কা প্রশমিত হইল। তারপর পুনরায় উভয়ে নিদ্রা গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বর্দ্ধমান জেলায় দত্তপরিবারের বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তি ছিল। অনেক দিবস যাবৎ তাহার হিসাব নিকাশ হয় নাই। নানা কারণে দত্তমহাশয় এ পর্য্যন্ত তাহার বিশেষ তত্ত্বাবধান করিতে পারেন নাই। এবার সেই জন্যই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন। দ্বিতীয় আর এক উদ্দেশ্যও ছিল। সেই জেলার মধ্যেই কোন গ্রামে ভদ্রবংশে একটী পরমাসুন্দরী বয়স্থা কন্যার কথা দত্ত মহাশয় শুনিয়াছিলেন। প্রবোধচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক থাকাতেও দত্তমহাশয় নিশ্চেষ্ট হন নাই। গত তিন চারি বৎসর যাবৎ নানা স্থানে পুত্রের সম্বন্ধের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কন্যা পসন্দ হইলে, দেনা পাওনার কথা পরিষ্কার হয় না; আবার দেনা পাওনার সুবিধা হইলে, কন্যা পসন্দ হয় না। দত্তমহাশয় ক্রমে দুই স্থানে সম্বন্ধ এক প্রকার ঠিক করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন মতেই প্রবোধকে স্বীকার করাইতে পারেন নাই। এবার এই মেয়ের কথা শুনিয়া মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন যে, পাত্রী যদি মনোমত হয়, তবে যৌতুকাদি সম্বন্ধে অধিক পিড়াপীড়ি করিবেন না; কেন না, প্রবোধের বিবাহে আর গৌণ করা যায় না। এবার প্রবোধের আপত্তি শুনিবেন না। দিন স্থির করিয়া কন্যা বাড়ীতে উঠাইয়া আনিবেন; বাধ্য হইয়া প্রবোধের বিবাহ করিতে হইবে।

দত্তমহাশয় তালুক প্রদর্শনে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, প্রথমতঃ সেই মেয়ে দেখিতে গেলেন। পরমাসুন্দরী মেয়ে,—তাহাতে বয়োধিকা,—তাঁহার সম্পূর্ণ মনোমত হইল। তার পর উঠিল যৌতুকাদির কথা; তাহাও এবার শীঘ্রই পরিষ্কার হইল। দত্তমহাশয় এই কার্য্যই করিবেন স্থির করিলেন; এবং মেয়ের পিতাকে সম্পূর্ণ আশ্বাস দিলেন। দিন

স্থির হইল; কথা হইল, দত্তমহাশয় তালুক হইতে বাড়ী আসিয়া পাত্রী আনাইয়া নিজ বাড়ীতেই পুত্রের বিবাহ দিবেন। এবার আর কোন বাধা বিপত্তি অথবা আপত্তি মানিবেন না। এই নূতন সম্বন্ধ যে স্থির করিলেন, দত্তমহাশয় সে সংবাদ বাড়ীতে জানাইলেন না।

তালুকের কাজ কর্ম্ম শেষ করিতে দত্তমহাশয়ের এক মাস গত হইল। তাহার পর তিনি বাড়ীতে রওয়ানা হইলেন। বাড়ীতে পৌঁছার পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নিজ গ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী এক স্থানে নৌকা রাখিয়া কোন এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। সেখানে নানা প্রসঙ্গের পর শুনিতে পাইলেন যে, বিনোদপুরের বৌকে তাঁহার বাড়ীতে আনান হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার আপাদ-মস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। দত্তমহাশয়ের ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা—কস্মিন্ কালে সে বৌকে গৃহে আনিবেন না। এতদূর সাধ্য কাহার যে, সেই ছোট লোকের মেয়েকে তাঁহার গৃহে আনিয়াছে? তিনি নূতন সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিয়াছেন; দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে পুত্রের আবার বিবাহ দিবেন; তাহার মধ্যে এই ব্যাপার! ক্রোধে দত্তমহাশয় অন্ধ হইয়া উঠিলেন। আত্মীয়টী সে রাত্রিতে তাঁহাকে সেখানে থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। দত্তমহাশয় কিছুতেই স্বীকার হইলেন না। রাত্রির মধ্যেই "—খেকোর বেটীকে" বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবেন, তবে তিনি জলগ্রহণ করিবেন। তৎক্ষণাৎ নৌকা খুলিয়া বাড়ী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

রাত্রি প্রায় বারটার সময় দত্তমহাশয় বাড়ীতে পৌঁছিলেন। বিনোদ-পুরের বৌ সম্বন্ধে দত্তমহাশয়ের ভয়ানক প্রতিজ্ঞা বাড়ীর পরিচারকবর্গও জ্ঞাত ছিল। শ্যামা চাকরাণী দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার আগমনবার্ত্তা গৃহিণী রাজলক্ষ্মী এবং নীরদার কাছে বলিল। তাঁহারা সভয়চিত্তে শয্যা

পরিত্যাগ করিয়া উঠানে আসিলেন। প্রবোধ এবং বাসন্তী তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত।

শ্যামা। "পাল্কী থেকে নামিয়াই যে চেঁচাচ্ছেন, ভয়ে আমার প্রাণ কাঁপিতেছে, মা ঠাক্‌রুণ।"

রাজ। "ও নীরু, আমি কি উপায় করিব? প্রবোধ কি ঘুমোচ্ছে?"

নীরদা। "দাদা এখনও টের পান্ নি। বৌ, দাদা দুজনেই ঘুমোচ্ছেন।"

রাজ। "এসেই ত আকাশ পাতাল এক করিয়া লইবেন এখন; আমি—আমি কি উপায় করিব?"

নীরদা। "মা, তুমি এখনি গা ছেড়ে দিলে? বাবা যে রাগ কর্‌বেন, তা তো আগে থিকেই জান। এখন তুমি সাহস না করিলে সব মাটি হইবে।"

রাজ। "রাগ হইলে কি ওঁর মানুষের স্বভাব থাকে যে, দু কথা বুঝাইয়া বলিব?"

শ্যামা। "তা দিদিমণি, অমন রাগ আর দেখি নাই; আমি তো কাছে যাইতেই সাহস পাইলাম না; গোপাল যেন কি বলিতেছিল, কর্ত্তা তাকে তাড়িয়ে মারিতে উঠিলেন। আমি দৌড়িয়া খবর দিতে আসিলাম।"

রাজ। "নীরু, তুই আমার কাছে থাক্;—শ্যামা, তুই যাস্‌নে।"

এদিকে দত্তমহাশয় বাহির বাটীতে গৌণ করিলেন না। চীৎকার করিতে করিতে ভিতর বাড়ীতে চলিলেন;—

"কার এমন সাহস!—কার এত বড় আস্পর্দ্ধা!"

ভিতরে প্রবেশ করিতে উঠানের মধ্যেই স্ত্রী কন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভৃত্যের হাতে আলো; দত্তমহাশয়ের দুই চক্ষু

রক্তবর্ণ; দেহকম্পমান। ক্রোধ-কম্পিতস্বরে দত্তমহাশয় বলিলেন ;—

"কে আনিল? আমার বাড়ীতে সেই ছোটলোকের মেয়েকে কে আনিল?"

গৃহিণী অনুচ্চস্বরে বলিলেন ;—

"চুপ কর; ছি! ছি! অমন করিয়া কথা বলিতে হয়? ঘরের বৌ ঘরে এয়েছে; তার জন্য এত চীৎকার কেন?"

দত্ত। (আরও উচ্চৈঃস্বরে) "বলি, আনিল কে? আমার প্রতিজ্ঞা, আমি বাঁচিয়া থাকিতে সেই পাজী লোকের মেয়ে আমার বাড়ীতে আসিতে—থাকিতে পারিবে না। আনিল কে?"

গৃহিণী। "চুপ কর; বৌ শুনিতে পাইবে; প্রবোধ শুনিতে পাইবে।—আমি মাথা কুটিয়া মরিব!"

দত্ত। "বৌ! কে আমার বৌ? আমি ছেলের বিবাহ দি নাই। এখনই আমি সেই নচ্ছার অজাতের মেয়েকে বাড়ী থেকে বাহির করিয়া দিব।"

গৃহিণী কর্ত্তার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন ;—

"চুপ্, চুপ্; ঘরে এস; আমি সব বলিতেছি। আমি গলায় ফাঁসি দিয়া, বিষ খাইয়া মরিব!"

দত্ত। "প্রবোধ, (উচ্চৈঃস্বরে) প্রবোধ, বাহিরে এস; বিনোদপুরের আশু মিত্রের মেয়ে আমার পুত্রবধূ নয়, তোমার স্ত্রী নয়।"

গৃহিণী জোর করিয়া স্বামীকে ঘরের দিকে টানিতে লাগিলেন। দত্তমহাশয় সবলে হাত ছাড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন ;—

"প্রবোধ, বিনোদপুরের আশু মিত্রের মেয়ে তোর স্ত্রী নয়। আমি তোর পিতা—বলিতেছি, যদি ঐ অজাতের মেয়েকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিস্, তবে তুই আমার পুত্র না। আজ হইতে ও তোর

দত্তমহাশয় আর বলিতে পারিলেন না ; গৃহিণী তাঁহার মুখ হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলেন।

এদিকে পিতার প্রথম উচ্চরব শুনিয়াই প্রবোধ জাগরিত হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিল। বাসন্তীও জাগিল,—চমকিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"কি হইয়াছে ?"

প্রবোধ বলিল ;—"বাবা আসিয়াছেন !"

বাসন্তী কাঁপিতে লাগিল। তখন প্রবোধ বাসন্তীর মস্তক নিজ বক্ষে স্থাপন করিয়া নীরবে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। এদিকে দত্তমহাশয়ের অগ্নিময় বাক্যস্রোতের বিরাম নাই। প্রবোধ খাট হইতে ভূমিতে নামিল ; বাসন্তীও নামিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল ; বাসন্তী কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া যায় দেখিয়া প্রবোধ তাহাকে শয্যাপার্শ্বে বসাইল। তখন স্ত্রীর ভীতিবিহ্বল মুখ চুম্বন করিয়া প্রবোধ বলিল ;—

"আমি বাহিরে যাই, বাসন্তি ; নীরদা তোমার কাছে আসিবে।" তখন দত্তমহাশয়ের শেষোক্ত পশূচিত বাক্য শ্রুত হইল। প্রবোধ বাসন্তীর গলদশ্রুপরিপ্লুত, চকিতনেত্র-সংযুক্ত সুগোল মুখের দিকে একবারমাত্র চাহিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল, কোন কথা বলিল না। অবনতমুখে দ্রুতপদে পিতার সম্মুখ দিয়া বাহির বাটীর দিকে চলিয়া গেল।

নীরদা পিতার ব্যবহারে হতবুদ্ধি হইয়াছিল ; প্রবোধকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া একাকিনী বাসন্তীর রক্ষার জন্য সেই গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহিণী স্বামীকে টানিয়া লইয়া অন্য গৃহে গেলেন।

নীরদা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল—ভূতলে অবলুণ্ঠিত বাসন্তীর অসংযত দেহে চেতনা নাই। তখন পার্শ্বস্থ জলপাত্র হইতে জল লইয়া তাহার মস্তক ও মুখে সিঞ্চিত করিতে লাগিল। এইরূপ শুশ্রূষায়

শীঘ্রই বাসন্তীর চেতনা হইল। নীরদা তখন পিতার পাষাণ হৃদয়কে এবং ভ্রাতার কাপুরুষত্বকে শত ধিক্কার দিতে লাগিল। বাসন্তী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল ;—

"কাহার নিন্দা কর, বোন্! আমার অদৃষ্ট, অদৃষ্ট!—শত জন্মের সঞ্চিত পাপ! কাহারও নিন্দা করিও না।"

এই বলিয়া বাসন্তী নীরবে কাঁদিতে লাগিল। নীরদা বলিল ;—

"বৌ, এ গৃহে যদি তোমার স্থান না হয়, আমিও তবে এ পাপগৃহে আর বাস করিব না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গৃহিণীর কথা, নীরদার চেষ্টা, বাড়ীর লোকজনের আকিঞ্চন—কিছুতেই কিছু হইল না। দত্তমহাশয় কিছুতেই বধূকে গৃহে রাখিতে স্বীকার করিলেন না। পরদিন অতি প্রত্যূষে পাল্কী-বাহক আসিল, সঙ্গীয় লোক জন স্থির হইল। বাসন্তী শ্বশুরগৃহ হইতে নির্ব্বাসিতা হইয়া পিত্রালয় চলিল।

ভিতর বাড়ীতে এক ক্ষুদ্র ঘরে বসিয়া বাসন্তী আর নীরদাতে কথা হইতেছিল। রাত্রির অবশিষ্ট ভাগে কাহারও আর নিদ্রা হয় নাই। নিদ্রা!—চোখের জলের বিরাম নাই, নিদ্রা কেমন করিয়া আসিবে?

বাসন্তী। "ঠাকুরঝি, দুদিনের জন্য অভাগিনী তোমাদের কাছে আসিয়াছিল; কত অপরাধ করিয়াছি, কত কি বলিয়াছি, কিছু মনে রাখিও না।"

নীরদা। "বৌ, বৌ, আমরা মানুষ নই, রক্ত মাংস দিয়া বিধাতা আমাদিগকে গড়েন নাই। তা না হইলে তোমাকে"—চক্ষু মুছিয়া—"বৌ, তোমাকে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি!"

বাসন্তী। "আমার কপাল মন্দ,—শত কোটী পাপে আমি পাপী! এমন শাশুড়ী, এমন ননদ, এমন—এমন সংসার আমায় ছাড়িতে হইল!"

নীরদা। "আমরা যদি মানুষ হইতাম, বাবা—দাদা যদি—"

বাসন্তী। "কেহই মন্দ নয়, বোন্; আমার কপাল মন্দ; কাহারও নিন্দা করিও না।"

নীরদা। "নিন্দা করিব না? দাদা যদি মানুষ হতেন—"

বাসন্তী। "ঠাকুর ঝি, তোমার পায়ে পড়ি,—"

নীরদা। "জানিয়া শুনিয়া নিরপরাধে নিজের স্ত্রীকে—"

বাসন্তী। "ঠাকুর ঝি, আমি তোমার দাদার মন জানি। স্বর্গ-সুখ আমি তোমাদের ঘরে আসিয়া পাইয়াছি; আমি অভাগিনী, তাই সে সুখ আমার কপালে সহিল না। আমার শেষ-কথা তাঁহাকে বলিও,—তাঁহার পদসেবা করিব, দাসীর ভাগ্যে তাহা লেখা ছিল না। আমি চলিলাম, আমার কথা—আমার কথা যেন ভুলিয়া যান।—তোমরা আমার কথা ভুলিয়া যাইও।"

বাসন্তীর দুই হাত নিজের হাতে ধরিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নীরদা বলিল;—

"বৌ, তোমাকে ভুলিব?—এ প্রাণের মধ্যে যে তুমি! হায়, হায়, তোমাকে ছাড়িয়া, কেমন করিয়া আমাদের দিন যাইবে?—দাদা এখন বুঝিতেছেন না, শেষে পাগল হইয়া যাইবেন।"

বাসন্তী। "আমার একটী কথা রাখিবে, ঠাকুরঝি?"

নীরদা। "কি কথা, বৌ?"

বাসন্তী। "আমি চলিলাম,—এ জন্মে আর দেখা হইবে না!—আমার একটী কথা রাখিও। আমি সকল কষ্ট সহিতে পারিব,—স্ত্রীলোকে কি না পারে?—কিন্তু তোমার দাদা যে সংসার ছাড়িয়া দিবেন, উদাসীন হইয়া থাকিবেন, তাহা শুনিলে মনে বড় ব্যথা পাইব, বোন্।—শুনিলাম, ঠাকুর এবার এক—এক সম্বন্ধ ঠিক করিয়া আসিয়াছেন,—তোমরা বলিয়া কহিয়া—তোমার দাদাকে স্বীকার করাইও। আমি অভাগিনী; আমি সমুদ্রে পড়িলাম, তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু বোন্, তোমার—তোমার দাদার কষ্টের কথা শুনিতে পারিব না।"

বাসন্তী থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল; নীরদাও কাঁদিয়া ন, বলিল;—

"বিধাতা, সংসারে এমন রত্নও আছে! দাদা, দাদা, বুঝিলে না—সহস্র পুণ্যে লোকের এমন স্ত্রী লাভ হয়। এমন রত্ন তুমি হেলায় ছাড়িয়া দিতেছ!"

পাল্কী প্রস্তুত। শ্যামা চাকরাণী আসিল; কথা কহিতে পারিল না, কাঁদিয়াই আকুল, তাহার মুখে কথা ফুটিল না।

বাসন্তী। "ঝি, কাঁদিও না। আমি অভাগিনী, আমার জন্য কাঁদিতে আছে? দুদিনের জন্য তোমাদের কাছে আসিয়াছিলাম, আবার চলিলাম।"

শ্যামা। "কাঁদিব না? দুঃখে যে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে! অমন মিষ্টি কথা আমাদের কে বলিবে? অমন করিয়া আমাদের সুখ দুঃখ আর কে বুঝিবে?"

বাসন্তী। "ঝি, আমাকে আর কাঁদাইও না।—ঠাকুর ঝি, তোমাদের এখানে আসিয়া এ দুদিন স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আজ আমার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিল!"

নীরদা। "আমারও এ গৃহে বাস করা শেষ হইল। তুমি চলিয়া গেলে আমি এক দণ্ডও এ বাড়ীতে থাকিব না; কি লইয়া থাকিব?"

বাসন্তী। "ঠাক্‌রুণের উপায় কি হইবে? তাঁহাকে কে দেখিবে? আমি অভাগিনী, তাঁহার সেবা করিতে পারিলাম না; তুমিও যাইবে?"

নীরদা। "বড় সাধ ছিল, বৌ, দাদার বিবাহ হইবে, বৌ ঘরে আসিবে, দাদার ছেলে হইবে,—কত সুখ হইবে! কত————"

নীরদা কাঁদিয়া ফেলিল।

"—দাদা বিবাহ করিলেন, কত কাল পরে সোণার বৌ ঘরে আসিল। —আজ আমাদের সব আশা ফুরাইল!—কি সুখে, কি আশায় আর এ ঘরে থাকিব?"

দ্রুতগতিতে মাতা রাজলক্ষ্মী সেখানে আসিলেন। স্বামীর সঙ্গে অনেক তর্ক, অনেক ঝগড়া, স্বামীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছেন. ফল হয় নাই। দৌড়িয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন ;—

"কৈ ? আমার বৌ কৈ ?"— দু'হাতে বাসন্তীকে জড়াইয়া ধরিয়া— "মা লক্ষ্মী আমার, আমি তোকে ছাড়িব না ; তাড়াইয়া দিন্, এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইব। তোকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। তুই চলিয়া গেলে, আমার ঘরের লক্ষ্মী চলিয়া যাইবে ; এ বাড়ী শ্মশান হইয়া পড়িবে !"

নীরদা। "মা, কোন মতে স্বীকার করাইতে পারিলে না ?"

রাজ। "মানুষ হইলে তো পারিব ? পাষাণে কি দয়া মায়া আছে ?"

গোপাল চাকর গৃহদ্বারে আসিয়া বলিল ;—

"মা ঠাকরুণ, দিদিবাবু, কর্ত্তা ভারি ধুম করিতেছেন ; বেহারারা বসিয়া রহিয়াছে, বেলা হইয়া পড়িল। বৌমাকে এখনই যাইতে হইবে। —মা ঠাক্‌রুণ, তুমিও রাখিতে পারিলে না ? এমন বৌমাকে তোমরা কেমন করিয়া ছাড়িয়া থাকিবে ? বৌমা চলিয়া গেলে বাড়ী যে আঁধার হইয়া পড়িবে, মা ঠাক্‌রুণ ?"

ঘরের ভিতর বাসন্তী বলিল ;—

"মা, বিদায় হই ; এ জন্মে আর ও পা-দুখানি দেখিব না ! জন্মের শোধ আজ কথা বলিলাম, মা ; দাসীর অপরাধ লইও না ; দাসী চরণে কত অপরাধ করিয়াছে, তাহা মনে রাখিও না, মা।"

মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ত্রিলোচন দত্ত বাহিরে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। বাসন্তী শাশুড়ীর পদযুগলে প্রণাম করিল। প্রণাম করিবার সময় তাহার অবিরল-বিনিস্সৃত-অশ্রুবারি বিন্দু বিন্দু গৃহিণীর পদপ্রান্তে নিপতিত হইল। তিনি কাঁদিয়া স্বামীকে শুনাইয়া বলিলেন ;—

"ওগো, তুমি মানুষ নও গো!"

ত্রিলোচন। "খবরদার!"

রাজ। "নিরপরাধে তুমি এমন বৌ ঘর হইতে তাড়াইয়া দিতেছ, বনবাসে দিতেছ, অকুল সমুদ্রে ভাসাইয়া দিতেছ! বনের যে পশু, তোমার চেয়ে তাদের হৃদয়েও দয়া মায়া আছে।"

ত্রিলোচন। "ঢের হইয়াছে, এখন চুপ কর। কেন তোমরা বাড়ীতে এ হাঙ্গামা উপস্থিত করিয়াছিলে? কি সাহস তোমাদের?"

রাজ। "সাহস তো নাই-ই। চিরটা কাল তুমি একভাবে শাসিয়ে আসিয়াছ; তুমি মানুষ নও গো, তুমি মানুষ নও! প্রবোধ কি বলিবে? সে কি মনে করিবে? কচি ছেলে নয়, তার মনের দিকেও তুমি একটা বার চাহিলে না! বিবাহ করিতে চাহিয়া ছিল না, ধমকিয়ে বিবাহ করাইলে; এক ছেলে তোমার, তার বিবাহে তুমি লোভ সামলাইতে পারিলে না! দুভরি সোণার জন্য তুমি আকাশ পাতাল এক করিলে?"

ত্রিলোচন। "চুপ্ করিবে কিনা, বল।"

রাজ। "অনেক সহিয়াছি, আর পারি না।——সেই বৌকে সে ঘরে আনিয়াছে, তাহাকে তুমি তাড়াইতেছ! প্রবোধের মত ছেলে, তাই তোমার রক্ষা।—শোন, বৌকে তাড়াইতে পারিবে না, আমি এ বৌ ছাড়িব না। বৌ এবাড়ী থেকে যাইবে তো আমিও যাইব। কি লইয়া থাকিব? তোমার ঘর সংসার লইয়া তুমি একা থাক, এ শ্মশান পুরীতে আমি বাস করিব না।"

ত্রিলোচন। "আমি একশো বার বলিয়াছি, ছেলের আবার বিবাহ দিব।"

রাজ। "প্রবোধ আর বিবাহ করিবে না। আজ চারি বছর

চেষ্টা করিয়াছ, পার নাই। তখনো বাছা বৌকে দেখে নাই!—তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পাইয়াছে!—আজ দুমাস সেই বৌ ঘরে আসিয়াছে; বাড়ীর লোকজন চাকর চাকরাণী বৌয়ের ইঙ্গিতের বশ হইয়াছে; এমন বৌ তাড়াইয়া দিলে প্রবোধ আবার বিবাহ করিবে?"

ত্রিলোচন। "আমি এবার সম্বন্ধ ঠিক করিয়া আসিয়াছি। ক'নে বাড়ীতে আনিয়া বিবাহ দিব।"

নীরদা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল; মাতা পিতায় কথা চলিতেছে, সে আর কি বলিবে? কিন্তু আর থাকিতে পারিল না; বলিল;—

"বাবা, দাদা আর বিবাহ করিবেন না।"

ত্রিলোচন। "আমি তাহাকে বিবাহ করাইব।"

নীরদা। "তিনি আর বিবাহ করিবেন না।"

ত্রিলোচন। "তাহাকে করিতেই হইবে।"

নীরদা। "বৌ বাড়ীতে থাকিতে পারিবে না?"

ত্রিলোচন। "না, না, না।"

রাজ। "তুমি ঘরের লক্ষ্মী বিসর্জ্জন দিতেছ, তোমার সংসারের আর মঙ্গল হইবে না।"

ত্রিলোচন। "না হয়, না হবে, সে জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

রাজ। "আজ ভাবিলে না, এর পর কাঁদিয়া মরিবে।"

ত্রিলোচন দত্ত তখন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন;—

"পাল্‌কী লইয়া বসিয়া থাকিবে নাকি?"

ঘরের ভিতর থরকম্পিত-কলেবরা বাসন্তী পড়িয়া যায়-যায় হইল, নীরদা তাহাকে ধরিল।

রাজলক্ষ্মী।" না, আর বসিয়া থাকিবে না। চল্, মা। এ পাপ পুরীতে লক্ষ্মীর স্থান নাই। আমার ঘর সংসার ফুরাইল।"

বাসন্তী রাজলক্ষ্মীর চরণে প্রণাম করিয়া পাল্কীতে উঠিল। রাজলক্ষ্মী উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

নীরদা পাল্কীর দরজা খুলিয়া বৌর সঙ্গে শেষ-দেখা করিল। বৌর পায়ের ধূলা লইয়া বলিল ;—

"যদি তোমাকে কখনও এবাড়ীতে আনাইতে পারি, তবে এগৃহে থাকিব, নতুবা এসংসারে বাস আমারও ফুরাইল।"

বাসন্তী যেন কি বলিতে চাহিল, তাহার কথা ফুটিল না।

বাহকগণ পাল্কী লইয়া চলিয়া গেল।

বাসন্তীর গৃহ সংসারের পরিসমাপ্তি হইল।

বৈঠকখানায় বসিয়া ত্রিলোচন দত্ত ভাবিতে লাগিলেন ;—

"আমার প্রতিজ্ঞা, আমি এ বৌ ঘরে রাখিব না। পোনের দিনের মধ্যে ক'নে বাড়ীতে আনিয়া প্রবোধের বিবাহ দিব।"

দত্তমহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মন আলোড়িত হইয়া উঠিল। প্রবোধ বিবাহ করিবে না? করিবে বৈকি।—কাজটা ভাল হইল কি? মনে সন্দেহ হইতেছে।—না! তুদিনেই সব ভুলিয়া যাইবে। কাঁচা বয়স, ওদের মনের কি আর স্থিরতা আছে? যাক্, আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখিব।

তখন প্রবোধের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। প্রবোধ বাড়ীতে নাই। বাড়ীর লোকজন ভৃত্যবর্গ কেহই তাহাকে দেখে নাই। নিকটবর্ত্তী বাটী সমূহে, নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে,—পথে, ঘাটে, মাঠে কোথায়ও প্রবোধকে পাওয়া গেল না। ক্রমে দূরবর্ত্তী আত্মীয় কুটুম্ব বাড়ীতে, কলিকাতায়, কোথায়ও আর প্রবোধের তত্ত্ব পাওয়া গেল না। এক

মাস, ডুইমাস, বৎসর কাটিয়া গেল ; প্রবোধ আর নাই। দত্তমহাশয় তখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। গৃহিণী অন্নজল প্রায় পরিত্যাগ করিলেন।

বধূবিসর্জ্জনের দিনই নীরদা পিত্রালয় ছাড়িয়া মাতুলালয়ে গিয়াছিল। প্রবোধ নিরুদ্দেশ হওয়া সংবাদে ফিরিয়া আসিয়াছিল, অভাগিনী শেষে তীর্থবাসে চলিয়া গেল ; বিধবার আর ঘর সংসার কি ?

নবম পরিচ্ছেদ

দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বৈশাখের পূর্ণিমারাত্রি; কিন্তু সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে অতি ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি ও মুহুর্মুহুঃ বজ্রপাত হইতেছে. শত শত ভীষণ কাল মেঘ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া প্রবলপ্রবহমান বায়ুস্রোতে দিগন্তভাগে ছুটিতেছে। চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারময়। ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গাবক্ষের ভয়াল তরঙ্গমালা এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিন্নসূত্র তরণী-সমূহের ভয়াবহ চিত্র বিদ্যুৎপ্রভায় স্পষ্ট প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। প্রবল বায়ুস্রোত শত শত প্রাসাদসৌধশিখরে এবং মন্দিরচূড়ায় প্রতিহত হইয়া ভয়ানক শব্দ উৎপন্ন করিতেছে, এবং শত সহস্র ভীতিগ্রস্ত নরনারীর ভয়ব্যঞ্জক ইষ্টনামোচ্চারণ-শব্দ তাহাতে মিশিয়া এক অপার্থিব বিকট কোলাহলে আকাশ নিনাদিত হইতেছে।

সেই ঘোর ভয়ঙ্কর রজনীতে বারাণসীক্ষেত্রে গঙ্গার ঘাটে এক সন্ন্যাসী স্নান করিতেছিলেন। গঙ্গাজলে শরীর আবক্ষ নিমজ্জিত করিয়া, সন্ন্যাসী আকাশের অনৈসর্গিক ভয়ঙ্কর চিত্রের দিকে চাহিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতেছিলেন; এমন সময় তরঙ্গবেগে ভাসমান কি যেন তাঁহার শরীরে প্রতিহত হইল; সন্ন্যাসী হাত বাড়াইয়া ধরিলেন—এক চেতনাপরিশূন্য স্ত্রীদেহ। তখন একটুকু সরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু স্ত্রীদেহ তরঙ্গবেগে পুনরায় তাঁহার শরীরে সংলগ্ন হইল। এবার সন্ন্যাসীর যেন কি সন্দেহ হইল। তিনি বামহস্তে রমণীদেহ দৃঢ় আবদ্ধ রাখিয়া, দক্ষিণহস্তে উহার বামহস্তের নাড়ী পরীক্ষা করিলেন;—নাড়ী নাই, কিন্তু তাঁহার সন্দেহ দূর হইল না। রমণীর কটিলগ্ন বস্ত্রে তাহার দেহ আচ্ছাদিত করিয়া দুই হাতে সেই রমণীদেহ তুলিয়া লইয়া সন্ন্যাসী দ্রুতপদে সোপানশ্রেণী উঠিতে লাগিলেন।

তখন আর বৃষ্টি নাই; বায়ুর বেগও অনেক প্রশমিত হইয়াছে; কিন্তু আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন, চতুর্দ্দিক অন্ধকার। তটে অদূরেই সন্ন্যাসীর আশ্রয়স্থান। এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের নীচে জীর্ণ ভগ্নপ্রায় একটি পুরাতন ক্ষুদ্র পাকা কুঠরী। বোধ হয় পূর্ব্বে এই গৃহ কোন দেবালয় ছিল। সন্ন্যাসী এই কুঠরীতে বাস করিতেন না। হাতের লেখা কতকগুলি পুথি, নানা প্রকার ঔষধের শিশি, গাছগাছ্‌ড়া এবং সামান্য আহার সামগ্রী—এই সকল এই গৃহে রাখিতেন। নিজে প্রায় বার মাস সেই পুরাতন দেবালয়ের সম্মুখে গাছের তলায় থাকিতেন। নিকটে এক প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড দিবারাত্রি জ্বলিত। সন্ন্যাসী সেই রমণীদেহ লইয়া সেই কুঠরী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণীর সর্ব্ব শরীর শীতল; অগ্নিসেকের নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু তখনও গাছের পাতা হইতে অনবরত বৃষ্টির জল পড়িতেছিল। বাহিরে আগুন জ্বালিবার উপায় নাই দেখিয়া সন্ন্যাসী কুঠরীর মধ্যে আগুন জ্বালিলেন। সেই ভয়ানক রাত্রিকালে ঘাটে অন্য জনপ্রাণীর সমাগম ছিল না; কাহারও নিকট সাহায্য পাইবার উপায় ছিল না। কিন্তু সন্ন্যাসী নিতান্ত অভ্যস্ত বিদ্যার ন্যায় মৃতপ্রায় রমণীর কৃত্রিম নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস-প্রক্রিয়া করাইতে লাগিলেন। রমণী কে, তখন এ চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই। যেই হউক, চেষ্টা করিলে এখনও তাহাকে বাঁচাইতে পারা অসম্ভব নহে দেখিয়া, সন্ন্যাসী প্রাণপণযত্নে সুদক্ষ চিকিৎসকের ন্যায় নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিলেন।

তাঁহার চেষ্টা সফল হইল। দুই ঘণ্টা পরিশ্রমের পর রমণীর প্রকৃত শ্বাসক্রিয়া মৃদু মৃদু হইতে লাগিল। তখন নিকটস্থ ইষ্টকখণ্ড সকল অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া রমণীর দেহে তাপ দিতে লাগিলেন। ক্রমে রমণী চক্ষু মেলিয়া চাহিল। সন্ন্যাসী তখন কিছু অবসর পাইয়া,

রমণীর মুখের দিকে চাহিলেন। কাঠের আগুনের আলো; ভাল করিয়া দেখা যায় না। কিন্তু যাহা দেখিলেন—দেখিয়া তিনি চমকিত হইলেন; তাঁহার সর্ব্বশরীর যেন তাড়িত-সংযোগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ শ্বাসক্রিয়ার উত্তেজনার জন্য, রমণীর বাহু ধরিয়া সঞ্চালন করিতেছিলেন; এখন হঠাৎ তাহার বামহস্তের অনামিকায় এক অঙ্গুরী দেখিতে পাইলেন। সেই অস্পষ্ট আলোকেও সে অঙ্গুরী সন্ন্যাসী চিনিতে পারিলেন,—তাহাতে কয়েকটী অক্ষর অঙ্কিত ছিল। সন্ন্যাসীর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। একখানি কম্বলে রমণীর দেহ আবৃত করিয়া গৃহমধ্যস্থ মৃৎপাত্র হইতে তাহাকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করাইলেন। কিছুকাল পরে রমণী উঠিয়া বসিল। শেষে কথা বলিল;—

"আপনি কে? আমি কোথায় আসিয়াছি?"

সন্ন্যাসী। "তুমি কাশীতে গঙ্গার ঘাটে রহিয়াছ। আমি সন্ন্যাসী। কোন ভয় নাই; এখন কথা বেশী কহিও না।"

রমণী কিছুকাল পরে আবার বলিল;—"আমি যে ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া জলমগ্ন হইয়াছিলাম, আপনি আমাকে বাঁচাইয়াছেন?"

সন্ন্যাসী। "আমি স্নান করিতেছিলাম, তোমাকে মৃতপ্রায় দেখিয়া তুলিয়া আনিয়াছি।"

রমণী। "কেন আনিলেন; মরিলেই আমার ভাল হইত।"

সন্ন্যাসী। "সে কি! মৃত্যুকামনা যে মহাপাপ।"

রমণী। "আমি মহাপাপী।"

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। চারিদিকে কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিল। কুঠরীর মধ্যে প্রভাতের আলো প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসী কুঠরীর দ্বারে, আর রমণী তাহার মধ্যে। সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে বলিলেন;—

"রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিল, যদি তুমি সবল বোধ কর, বল, তোমাকে কোথায় রাখিয়া আসিব।"

রমণী কথার উত্তর দিল না; সন্ন্যাসীর মুখে প্রভাতের আলো প্রতিভাত হইতেছিল। রমণী অনিমেষ নয়নে সেই মুখ দেখিতেছিল। সন্ন্যাসীর মস্তকে জটাভার; গঙ্গাস্নান হেতু সর্ব্বশরীরে মাখা ভস্ম বিধৌত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার গৌরকান্তি সেই মৃদু আলোতে উদ্ভাসিত হইতেছিল।

সন্ন্যাসী আবার বলিলেন ;—

"তোমার বাড়ী কোথায়? তুমি কাহার কন্যা? তোমাকে কোথায় পাঠাইব?"

রমণী। "ঠাকুর, আমার বাড়ী নাই; আমার কেহ নাই; আমার যাইবার স্থান নাই। মরণই আমার ভাল ছিল।"

সন্ন্যাসী। "তোমার হাতে এয়োতির চিহ্ন, সীমন্তে সিন্দূর; তুমি যে সধবা।"

তখন প্রভাতসূর্য্যের নবীন কিরণে গৃহ আলোকিত করিয়াছে। রমণী উঠিয়া বসিয়া একদৃষ্টে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিল; পরে বলিল ;—

"ঠাকুর, আপনি আমার প্রাণ দান করিয়াছেন, আপনার নিকট আমার আর একটি ভিক্ষা আছে।"

রমণীর স্বর বড়ই কাতর, বড়ই করুণ; তাহার শরীর কাঁপিতেছিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন ;—"কি ভিক্ষা?"

রমণী। "আপনি কুসুমহাটী—বিনোদপুর গ্রাম চিনেন?—আমি স্ত্রীলোক, নিঃসহায় নিঃসম্বল, সংসারে আমার কেহই নাই; আমাকে যথার্থ বলিবেন।"

সন্ন্যাসীর চক্ষু দিয়া তখন দরবিগলিত অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। দুই হাতে চক্ষু মুছিয়া একটুকু সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন ;—

"বাসন্তি, যথার্থ সন্দেহ করিয়াছ ;—আমি !"

বাসন্তী সেই দুর্ব্বল শরীরে উঠিয়া স্বামীর পদপ্রান্তে পড়িল। প্রবোধ আত্মহারা হইল। সংযতচিত্ত সন্ন্যাসী বাসন্তীকে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পুনরায় তাহাকে শয়ান করাইয়া তাহার শুশ্রূষা আরম্ভ করিল।

বাসন্তী চেতনাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

এইরূপ অভূতপূর্ব্বভাবে, অসম্ভব স্থানে, অসম্ভব সময়ে, বিচ্ছিন্ন দম্পতি পুনর্ম্মিলিত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

কিছুকাল পরে বাসন্তী চৈতন্য লাভ করিল। তখন কুসুমহাটী ত্যাগের পর হইতে আত্মবৃত্তান্ত পরস্পর পরস্পরের নিকট কহিতে লাগিল। প্রবোধ সেই রাত্রিতেই পিতৃগৃহ—গ্রাম ছাড়িয়া অনেকদূর চলিয়া গিয়াছিল। শয্যা হইতে উঠিবার সময় সোণার চেইনযুক্ত একটা ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিয়াছিল; এবং তন্মুহূর্ত্তে চলিয়া আসাতে তাহাইমাত্র তাহার সঙ্গে ছিল। টাকা কড়ি কিছু সঙ্গে ছিল না, কিন্তু যে সংসার-ত্যাগী, তাহার অর্থের কি প্রয়োজন? অতিথি হইয়া, ভিক্ষা করিয়া গ্রামের পর গ্রাম ছাড়াইয়া আসিল। পরে কলিকাতা গেল; কিন্তু কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করিল না। সেখানে সেই ঘড়ি আর চেইন বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া একেবারে রেলপথে পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া গিয়াছিল; সুতরাং দেশে যে অনুসন্ধান হইল তাহাতে কোন ফল হইল না। প্রবোধ নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া শেষে কাশীতে উপস্থিত হইল। সেখানে এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ব্রহ্মচারী তাহার জীবনী শুনিয়া পুনঃসংসারে প্রবেশ করিবার জন্য তাহাকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন; প্রবোধ স্বীকার হইল না। শেষে সেই ব্রহ্মচারীর উপদেশে দীক্ষিত হইয়া, প্রবোধ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গঙ্গাতটে সেই বৃক্ষমূলে বাস করিতেছিল। সংসারধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া পরহিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। চিকিৎসাশাস্ত্র সম্যক্ অধীত থাকাতে, লোক-হিতকর কার্য্যে তাহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

তারপর বাসন্তীর কথা।

তাহার পরদিন প্রভাতে বাসন্তী বিনোদপুর প্রেরিত হইল।

অভাগিনী কন্যার দুঃখে মায়ের বুক ফাটিয়া গেল। অর্থাভাবে শত প্রকারে সেই দুঃখের বৃদ্ধি হইল। শ্বশুর শাশুড়ী আর আর কোন তত্ত্ব করিলেন না। স্বামী নিরুদ্দেশ, মাতার দিনপাত কষ্ট; সংসারে আর কষ্ট যন্ত্রণার বাকি কি ? (শুনিয়া শুনিয়া প্রবোধের চিত্ত বিকল হইল;—বাসন্তীও কাঁদিতে লাগিল।) গ্রামিক লোকদিগের সঙ্গে তীর্থযাত্রায় বাহির হইল; সঙ্গে মা ছিলেন না। তিনি বাড়ীতে আছেন। পূর্ব্ব দিবস রাত্রিতে প্রবল ঝড়ে সমগ্র যাত্রীসহ নৌকা জলমগ্ন হইয়াছিল। কে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, বাসন্তী তাহা জানে না।

তাহার পর দুজনে ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল।

প্রবোধ। "সংসার দুঃখময়; তুমি আমি দুঃখ করিবার কে ?—এই ঘরে বিশ্রাম কর; আমি একবার দেখিয়া আসি, কাশীবাসী কেহ আমাদের দেশে ফিরিয়া যাইবে কি না।"

বাসন্তী বলিল ;—"যাইও না, বসো।"

দশ বৎসর পরে অভাগিনীর স্বামী সন্দর্শন। যে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি চিরজীবনে হয় না, তাহা কি দুই চারি দণ্ডের আলাপে মিটিবে ? দশ বৎসরব্যাপী সংযম করিয়া স্বামী যে মায়ার পাশ অনেক বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, বাসন্তী তাহা বুঝিতে পারিল না।

"যাইও না, লোক খুঁজিয়া কি হইবে ?"

প্রবোধ। "তোমাকে গৃহে পাঠাইব।"

বাসন্তী। "গৃহ ! গৃহ কোথায় ?"

প্রবোধ। "তোমার মাতার গৃহে তোমাকে পাঠাইব।"

বাসন্তী। "স্বামী বর্ত্তমানে যে স্ত্রীর গৃহ নাই, তাহার আবার গৃহ কোথায় ?"

প্রবোধ। (অতি ক্লিষ্টস্বরে)—"বাসন্তি, আমি গৃহ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছি ; যতদিন জীবন আছে, এইখানে এই ভাবে কাটাইব ; আমি সন্ন্যাসী।"

বাসন্তী। "তুমি সন্ন্যাসী, আর আমি গৃহবাসী হইব ? স্ত্রী তো স্বামীর সহধর্ম্মিণী !"

প্রবোধ। "এ কষ্ট রমণীশরীরে সহ্য হইবে না। আমি সংসার ছাড়িয়াছি, কিন্তু চক্ষের উপর তোমার কষ্ট দেখিতে পারিব না।"

বাসন্তী। "আর আমি চোখের অন্তরালে থাকিয়া দিবারাত্রি যন্ত্রণায় দগ্ধ হইলে, তুমি আপন চিত্ত প্রসন্ন রাখিবে ?"

প্রবোধ অনেক দিন যাবৎ চিত্তসংযম অভ্যাস করিতেছিল ; কিন্তু তাহার হৃদয় আজ অধীর হইল। বলিল ;—

"চিত্ত স্থির রাখিতে চেষ্টা করিব, বাসন্তি।"

বাসন্তী। "শোন, আমি চিত্ত স্থির করিয়াছি। গৃহে ফিরিব না। কি সুখের আশায় গৃহে ফিরিব ? আমার গৃহ কোথায় ? যেখানে স্বামীর আবাস, সেই স্থানই স্ত্রীর গৃহ। যে স্ত্রী একদিনমাত্র স্বামীর ভালবাসা পাইয়াছে, সে স্বামীর হৃদয় বুঝিতে পারিয়াছে। দেবতার অনুগ্রহে আমি এক মাসের অধিককাল তোমার সহবাসে কাটাইয়াছি ; আমি তোমার হৃদয় জানি। এখনও তুমি আমাকে ভুলিতে পার নাই—আমাকে ভালবাস, তাই তোমার আশঙ্কা হইতেছে, আমি কাছে থাকিলে তোমার যোগব্রত ভঙ্গ হইবে !"

বাসন্তীর স্বর অতি পরিষ্কার, অতি মধুর ; স্বামীর মুখের দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বাসন্তী পুনরায় বলিল ;—

"আমি দেশে যাইব না। যখন তোমার দেখা পাইয়াছি, তখন আর তোমাকে ছাড়িব না। আশঙ্কা করিও না, আমি তোমার

যোগভঙ্গ করিব না। আমিও মন্ত্র গ্রহণ করিব। তুমি যেরূপ চিত্ত বিজয় করিতেছ, আমিও সেইরূপ চিত্তসংযম করিতে চেষ্টা করিব। দেবতা আমার সহায় হইবেন। স্ত্রীলোকের হৃদয়ে বল আছে। আমি তোমার স্ত্রী, কেন আমাকে সহধর্ম্মিণী করিবে না ?”

প্রবোধ কথা বলিল না; জিহ্বাতে আর তাহার বিশ্বাস নাই। মুখ অবনত করিয়া রহিল, বাসন্তীর দিকে চাহিল না ;—চক্ষু আর তাহার আত্মবশ থাকে না। কিন্তু তাহার থরকম্পমান্ অধরোষ্ঠ এবং জল-ভারাক্রান্ত নয়নদ্বয় উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের উদ্বেলতরঙ্গমালার পরিচয় দিতে লাগিল। হরি! হরি! এই ধনধান্য-পরিপূর্ণা, শতবিহঙ্গ-নিনাদপ্রতি-ধ্বনিতা, শতপ্রফুল্লকুসুমসুবাসিতা সুন্দর ধরণী; এই সাধ্বী, সুদুর্লভা, চিত্তবিনোদিনী সহধর্ম্মিণী !—বিধাতঃ, অদৃষ্টে এ কি লিখিয়াছিলে ?

বাসন্তী আবার বলিল ;—“ভয় করিও না; আমি তোমার ধর্ম্মপথের প্রতিজ্ঞাপালনে বিঘ্নকারিণী হইব না ;—যদি হই, যদি আত্মবশ করিতে না পারি—আত্মঘাতিনী হইব। আমাকে আর পায়ে ঠেলিও না।”

প্রবোধ। “ঈশ্বর জানেন, কখনও তোমাকে পায়ে ঠেলি নাই। আজও তুমি হৃদয়—। আমি কাপুরুষ, তাই তোমাকে দূরে রাখিতে চাহিয়াছিলাম। আপন চিত্তে এখনও আমার বিশ্বাস নাই, তাই তোমাকে চক্ষুর বাহিরে রাখিতে চাহিয়াছিলাম। বাসন্তি, আমার গুরু পরম জ্ঞানী, আজ তাঁহার অনুমতি লইয়া যোগধর্ম্মের সহায়স্বরূপ তোমাকে এখানে রাখিব। ঈশ্বর আমাদিগকে সংযমব্রতে বলীয়ান করিবেন।”

তখন দুই জনে গললগ্নবস্ত্রে জানু পাতিয়া বসিয়া ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া আমরণকাল নিষ্কাম, নিস্বার্থভাবে পরস্পরের ধর্ম্মজীবনের সহায় হইয়া যোগসাধন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

ক্রমে বেলা হইল। শত শত নরনারী গঙ্গার পুণ্য সলিলে স্নান করিতে আসিল। এমন সময় ব্রহ্মচারী স্বয়ং সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রবোধ অগ্রসর হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সমস্ত কথা গুরুকে পরিজ্ঞাত করিল। শুনিয়া ব্রহ্মচারীর চিত্ত বিস্ময়সমাকুল হইল। তিনি কুঠরীর দ্বারে আসিয়া বাসন্তীকে বলিলেন ;—

"শোন, মা, আমি তোমার স্বামীর মন্ত্রদাতা গুরু ; আমি পিতা, তুমি কন্যা। আমার কাছে লজ্জা করিও না।—তুমি কেন এই কঠিন ব্রত অবলম্বন করিতে বসিয়াছ ? আজও তোমার এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিবার সময় হয় নাই। মা, তোমার সাহস অতুল ; কিন্তু রক্তমাংসের শরীর জয় করা সহজ নহে।"

বাসন্তী কুঠরী হইতে বাহির হইল। আর্দ্র বস্ত্র অগ্নিসন্তাপে শুষ্ক হইয়াছিল। আসীমন্ত মস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া, বাসন্তী ব্রহ্মচারীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া, দাঁড়াইল।

বাসন্তীর বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর হইয়াছিল। দত্তমহাশয় পরমা-সুন্দরী দেখিয়াই পুত্রের বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। আজি এবয়সে, এত কষ্ট যন্ত্রণার পরেও বাসন্তীর রূপ অতুলনীয়। আজ স্বামীসম্মিলনে সেই রূপ স্বতঃই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সেই অবেণীসম্বন্ধ আজানুলম্বিত নিবিড় কেশরাশি, উজ্জ্বল সিন্দূর-বিন্দু-পরিশোভী সীমন্তযুক্ত বিস্তৃত সুন্দর ললাট, বালেন্দুবক্র কৃষ্ণ ভ্রূযুগসমন্বিত আয়ত চক্ষু দেখিয়া ব্রহ্মচারী মুখ নত করিলেন ; বলিলেন ;—

"মা, তুমি গৃহে যাও ; এ কঠোর ব্রত তোমার উপযোগী নহে।"

বাসন্তী বলিল ;—"আপনি পিতা, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ মহাজ্ঞানী। আমার স্বামীর যে ধর্ম্ম, আমারও সেই ধর্ম্ম। আপনি আমাকে দীক্ষিত করুন।"

ব্রহ্মচারী বাসন্তীকে স্বীকার করাইতে পারিলেন না। অবশেষে ব্রহ্মচারী বলিলেন :—

"স্বামী স্ত্রী উভয়েই শোন ; এখনও তোমাদের এ ধর্ম্ম সাধন করিবার সময় হয় নাই। তোমরা ফিরিয়া সংসারে যাও ; তাহাতে তোমাদের পাপ হইবে না। ক্রোধোন্মত্ত জনকের অসঙ্গত বাক্য পালন না করিলে দোষ হইবে না।"

স্বামী স্ত্রী কেহই স্বীকার হইল না।

তখন ব্রহ্মচারী বিদায় হইলেন ; বলিয়া গেলেন ;—

"স্থিরচিত্তে উভয়ে আমার কথা ভাবিয়া দেখিও। তোমাদের যে বয়স, তাহাতে গৃহস্থাশ্রমই তোমাদের শ্রেয়। আমি কাল আসিব ; গৃহে ফিরিয়া যাইতে যদি তোমাদের মতি না হয়, কাল তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

পর দিবস জাহ্নবীতটে, সেই বটবৃক্ষমূলে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। বাসন্তী ভৈরবীবেশে স্বামীর বামভাগে বসিয়াছে। তাহার সেই নিবিড়কৃষ্ণ অতুলনীয় কেশরাশি জাহ্নবীজলে বিসর্জ্জিত হইয়াছে। সীমন্তের সিন্দুর আরও স্ফুটীকৃত হইয়াছে। তাহার পরিধানে গৈরিক বসন, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতিভস্ম মাখা, গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা; কিন্তু তাহার মুখে বিষাদের লেশমাত্র নাই;—কি যেন দৈব তেজে তাহার মুখমণ্ডল প্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই সংসারত্যাগী নবীন দম্পতির সম্মুখে বসিয়া ব্রহ্মচারী গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। শত শত নরনারী সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে একত্রিত হইয়াছে। দর্শক শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই সন্ন্যাসীকে চিনিত এবং বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। আজ তাঁহাকে সস্ত্রীক দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল।

ব্রহ্মচারী যথাশাস্ত্র দম্পতির দীক্ষাকার্য্য শেষ করিয়া বলিলেন;—

"আজ হইতে তোমরা অসংসারী হইলে। লৌকিক স্বামীস্ত্রী সম্বন্ধ তোমরা ভুলিয়া যাও। পরহিত-কার্য্য তোমাদের জীবনের ব্রত হউক, ঈশ্বরচিন্তাই আজ হইতে তোমাদের কার্য্য। চিত্তসংযম করিয়া এক বৎসর তোমরা অদ্যকার দত্ত মন্ত্র জপ কর; বৎসরান্তে আমি তোমাদিগকে উচ্চতর মন্ত্র প্রদান করিব। সেই উচ্চ মন্ত্র গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে, যদি তোমাদিগের পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিবার বাসনা হয়, আমাকে জানাইও। আমি আবার তোমাদিগকে বলিতেছি,—স্বামী-স্ত্রী আপ্রৌঢ় কাল গার্হস্থ্য ধর্ম্মাচরণ করিবে। শেষাবস্থায় বানপ্রস্থের বিধি। গুরুর অনুমতি গ্রহণে তোমরা পুনরায় সংসারী হইলে, তোমাদের কোন প্রত্যবায় হইবে না।"

প্রবোধ এবং বাসন্তী তখন গুরুচরণে প্রণাম করিয়া সন্ন্যাস-ব্রতাবলম্বন করিল।

সেই বটবৃক্ষমূলই তাহাদের আশ্রয়স্থল হইল। বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা,—শরৎ আসিল, তাহারা সেই বটবৃক্ষমূলে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড মাত্র ব্যবধানে থাকিয়া জপ, যোগ এবং সংযম অভ্যাস করিতে লাগিল। রোগীর শুশ্রূষা এবং চিকিৎসা তাহাদের অন্যতর প্রধান কার্য্য হইল। পুরবাসীরা এই নবীন সন্ন্যাসীসন্ন্যাসিনীর ব্যবহার, তপশ্চর্য্যা এবং চিত্তসংযম দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

কিন্তু মন্ত্রদাতা বৃদ্ধ ব্রহ্মচারীর চিত্তে প্রবোধ মানিল না।

গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলী-পলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ ॥

কিন্তু আজিও এই দম্পতির যৌবনের উচ্ছ্বাস গত হয় নাই, আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় নাই; কেবল দমন চেষ্টা হইতেছে মাত্র। এ চেষ্টা সফল হইবে কি?

অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধ বশানুগং ॥

দূরদর্শী ব্রহ্মচারীর মনের সন্দেহ দূর হইল না। বৎসর শেষের দুইমাস পূর্ব্বে একদিবস ব্রহ্মচারী প্রবোধ এবং বাসন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন;—

"আজ আমি দেশভ্রমণে বাহির হইব; ফাল্গুণের পূর্ণিমা তিথিতে ফিরিয়া আসিব। সেই দিবস তোমাদের নিয়মিত বৎসরকাল পূর্ণ হইবে। আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিব। আমার ফিরিয়া আসা সময় পর্য্যন্ত, অনুষ্ঠিত যোগধর্ম্মের ব্যাঘাত-কার্য্য করিও না। পূর্ব্ব কথা মনে রাখিও;—বৎসরান্তে বাসনা হইলে তোমরা পুনঃ সংসারী হইয়া গৃহস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারিবে।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ফাল্গুণের শুক্লা চতুর্দ্দশীরাত্রি। আকাশে মেঘের লেশমাত্র নাই; চন্দ্রকিরণে গভীর নীলিম আকাশ প্রভাসিত হইয়াছে। গঙ্গাবক্ষে মৃদুসঞ্চারিত বীচিমালা চাঁদের কিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। গঙ্গাতটে সেই মহামহিমাময়ী নগরীর শত শত মন্দিরপ্রাসাদশিখর চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে। আর সেই বটবৃক্ষমূলে—যেখানে নবীন দম্পতি সংসার ভুলিয়া, মায়ামোহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া যোগাভ্যাস করিতেছিল,—সেখানেও বটপত্রাবলীব্যবধানে চাঁদের আলো প্রবেশ করিয়াছে। অদূরস্ফুট-কুসুমসৌরভে সুবাসিত, গঙ্গাশীকরসিক্ত সুশীতল মৃদুবায়ু গাছের পাতা মৃদু নিনাদিত করিয়া বহিতেছিল। বহুদূরে—নিকটে—মাথার উপরে সেই বটবৃক্ষের শাখায়,—শত শত কোকিল ডাকিয়া দিগন্ত আকুল করিতেছিল।

এই পরমরমণীয় গভীর নিশীথে জনমানবগতিপরিশূন্য সেই বটবৃক্ষ-মূলে বাসন্তী এবং প্রবোধে কথা হইতেছিল। রাত্রি প্রভাত হইলেই ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি পড়িবে; ব্রহ্মচারী ফিরিয়া আসিবেন। ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণের আর অতি অল্প সময় অবশিষ্ট আছে।

প্রবোধ। "কি করিবে, বাসন্তি? আজ সম্বৎসর পূর্ণ হইল!"

বাসন্তী। "কি করিব? বিধাতা অদৃষ্টে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই করিব।"

প্রবোধ। "সংসার না সন্ন্যাস?"

বাসন্তী। "আমার সংসার কোথায়!

ক্ষণকাল কেহই আর কিছু বলিল না।

প্রবোধ। "আমি আজ দশ বার বৎসর গৃহত্যাগী; আর গৃহস্থ-

ধর্ম্মাচরণ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,—কেন তুমি গৃহে ফিরিয়া গেলে না ?"

বাসন্তী। "স্বামীশূন্য গৃহ স্ত্রীর গৃহ নহে ;—এই গাছের তলাই আমার গৃহ।"

প্রবোধ। "সম্বৎসর পূর্ণ হইতেছে, গৃহ কি বৈরাগ্য এই দণ্ডে স্থির করিতে হইবে।"

বাসন্তী। "তুমি কি আজও তাহা স্থির কর নাই ?"

প্রবোধ। "করিয়াছিলাম,—কিন্তু তুমি আসিলে কেন ?"

বাসন্তী কোন উত্তর করিল না। প্রবোধ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাসন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শেষে বলিল ;—"একবার কাছে এস, বাসন্তি, একবার চক্ষু ভরিয়া তোমাকে দেখিব।"

বাসন্তীর দেহ প্রস্তর-নির্ম্মিতবৎ গুরুভার এবং অবশ হইয়া উঠিল ; তাহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অতি ধীর, অতি মৃদুগমনে নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিকুণ্ড অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করিয়া বাসন্তী স্বামীর সম্মুখে যাইয়া উপবেশন করিল। তাহার পরিধানে গৈরিক বসন, মস্তকে অংসবিলম্বিত জটারাশি,—আর সে সুন্দর কেশরাশি নাই ; হাতে লোহার বালা আর শাঁখা, সীমন্তে সিন্দূর, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-ভস্ম। কম্পিতকলেবরে বাসন্তী স্বামীর সম্মুখে যাইয়া বসিল।

প্রবোধ। "সংসার সুখ না দুঃখের স্থান, বাসন্তি ?"

বাসন্তী অতি মৃদু স্বরে বলিল,—"সুখ দুঃখ মানুষের মনে।"

প্রবোধ। "মনে করিলেই কি মানুষ সুখী হইতে পারে ? সুখের ইচ্ছা কাহার নাই ? আর সুখের উপাদানে তো সংসার পরিপূর্ণ ; তবে আমরা কেন অসুখী ?"

বাসন্তী। "কিসে আমরা অসুখী ?"

প্রবোধ। "কিসে অসুখী ? মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, ধনসম্পত্তি, রূপযৌবন,—আমাদের নাই কি ? সংসারে আসিলাম, এ সকল আমরা কেন ছাড়িতেছি ? কেন কামনার সামগ্রী দুহাতে ঠেলিতেছি ?"

বাসন্তী। "গৃহস্থের সুখ আমাদের অদৃষ্টে নাই।"

অসময়ে মাথার উপর ডালে বসিয়া কোকিল ডাকিতে আরম্ভ করিল।

প্রবোধ। "কেন অদৃষ্ট মানিব ? ইচ্ছাধীন সুখ,—হাতের স্বর্ণ দূরে ফেলিয়া, অদৃষ্টের নিন্দা করিব ?"

বাসন্তীর গা কাঁপিতেছিল, বলিল ;—

"আমি স্ত্রীলোক—অবোধ,—কর্ম্মফল মানি।"

অসময়ে বসন্তের মৃদু বায়ু সন্ন্যাসীর আশ্রম কুসুমসৌরভে পরিপূরিত করিল।

প্রবোধ। "তুমি মান, আমি কাপুরুষ, আমিও মানি। নতুবা গৃহসংসার, ভোগবাসনা সকল পরিত্যাগ করিয়া আমরা এখানে কেন ?"

বাসন্তী। "তুমিই বলিয়াছিলে—ভোগে সুখ বটে, কিন্তু নিবৃত্তিতে পরম সুখ।"

বসন্তচতুর্দ্দশীর চন্দ্রালোকে বাসন্তীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখের গৌরকান্তি অসময়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। হরি! হরি! চাঁদের কিরণও সময় বুঝিল না!

প্রবোধ চন্দ্রকরোদ্দীপ্ত বাসন্তীর মুখের দিকে নীরবে এক দৃষ্টে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল। অবশেষে হঠাৎ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বিস্ফারিত নেত্রে প্রবোধ বলিল ;—

"বাসন্তি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আর গৃহধর্ম্ম করিব না—

আমরা তপশ্চর্য্যা করিব ; কিন্তু—” প্রবোধ থামিয়া গেল ; ক্ষণকাল তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, পরিশেষে আবেগপূর্ণ উচ্চতর স্বরে বলিল ;—

“বাসন্তি, এখান হইতে চলিয়া যাও, নতুবা রাত্রি প্রভাতে আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব। আমার চিত্ত দুর্ব্বল, তুমি কাছে থাকিলে আমার ব্রতভঙ্গ হইবে।”

এই বলিয়া প্রবোধ পশ্চাৎমুখ হইয়া বসিয়া পড়িল, এবং দুই হাতে চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া প্রবল গলদশ্রুরাশির বেগ প্রশমিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বাসন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল ; একবারমাত্র স্বামীর দিকে চাহিয়া লইল। তাহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত, শরীর মৃদুবায়ুপরিচালিতা পুষ্পভারপরিনম্রা লতার ন্যায় প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। বাসন্তী নীরবপদসঞ্চারে বৃক্ষমূলস্থিত জীর্ণ মন্দিরে প্রবেশ করিল।

রক্তমাংসে গঠিতদেহ নরনারি, ইহাদিগের এই চিত্তবিকারে আশ্চর্য্যান্বিত হইও না। যদি কেহ সংযতচিত্ত মহাযোগী থাক, যদি কেহ তপঃসিদ্ধ পরমহংস থাক—তোমাদিগকে বলিতেছি না। যাহারা রক্তমাংস, অন্নজল, শীতগ্রীষ্মের দাস—তাহারা কেহ এ দম্পতির চিত্তবিকার দেখিয়া বিস্মিত হইও না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বাসন্তী সেই জীর্ণ ইষ্টকমন্দিরে প্রবেশ করিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া ইষ্টদেব স্মরণ করিল। পরে স্বামীর চরণোদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিল ;—

"আমার জন্য তোমার ব্রতভঙ্গ হইবে ?—আমি তো বলিয়াছিলাম, যদি তোমার তপস্যার ব্যাঘাত হই,—আত্মহত্যা করিব !"

বাসন্তী দুই হাতে চক্ষুর জল মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল ;—

"আমি চলিয়া যাইব ? কোথায় যাইব ? আমার আর কে আছে—কি আছে ? তোমার পায়ের কাছে থাকিব মনে করিয়াছিলাম ;—তাহাতে তোমার ব্রতভঙ্গ হইবে ! আমি চলিলাম। যদি পুনর্জ্জন্ম থাকে. তবে তোমাকে অবশ্যই পাইব। ইহ জন্মের মত, স্বামী——প্রাণ——প্র——, বিদায় হইলাম !"

বাসন্তী উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই মন্দিরে প্রবোধ চিকিৎসার জন্য নানা প্রকার ঔষধ রাখিত ;—বিষাক্ত, মধুর, তিক্ত নানা প্রকার ঔষধ সেখানে ছিল। বাসন্তী অনেক ঔষধের গুণ ও কার্য্য স্বামীর নিকট শিক্ষা করিয়াছিল ; খুঁজিয়া খুঁজিয়া একটী শিশি বাহির করিল ; তাহার প্রায় অর্দ্ধভাগ বিষপূর্ণ ছিল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বাসন্তী সেই বিষ অকাতরে পান করিল।

এদিকে রাত্রি প্রভাতোন্মুখ হইয়া আসিল। প্রবোধ কিছু কাল পরেই প্রকৃতিস্থ হইল। দেবতা সাক্ষী করিয়া, আমরণ কাল সুখে, দুঃখে, সম্পদে বিপদে, জীবনসহচরী করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া, কি অপরাধে আজ তাহাকে পরিত্যাগ ?—প্রবোধ উঠিয়া দাঁড়াইল। বাসন্তীকে নিকটে না দেখিয়া তাহার চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এমন সময় বাসন্তী জীর্ণ মন্দির হইতে বাহির হইল।

প্রবোধ। "বাসন্তি, যাইও না, বসো। আমি কাপুরুষ; আমাকে ঘৃণা করিও না।"

বাসন্তী অতি প্রশান্ত স্বরে বলিল;—

"তোমাকে ঘৃণা করিব? তুমি যে দেবতা! বিদায়কালে তোমাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। আমার সহস্র অপরাধ ভুলিয়া যাইও।"

এই বলিয়া নতজানু হইয়া স্বামীর চরণে প্রণত হইল; তাহার দ্রুতবিগলিত অশ্রুবিন্দুসকল প্রবোধের পদপ্রান্তে বিচূর্ণিত হইতে লাগিল। প্রবোধ অতি যত্নে দুই হাত দিয়া তাহাকে উঠাইয়া বসাইল।

প্রবোধ। "যাইও না, দাঁড়াও, আমিও যাইব; দুই জনে একত্রে যাইব।"

প্রবোধের চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল।

বাসন্তী। "দুই জনে কোথায় যাইব? তুমি থাক, কেন ব্রতভঙ্গ করিবে?—আমি যাত্রা করিয়াছি!"

প্রবোধ। "এ ব্রত আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, আজি হইতে আমি এ ব্রত পরিত্যাগ করিলাম। তুমি সহধর্ম্মিণী, তোমা ছাড়া আমার আর পৃথক্ ধর্ম্মাচরণ নাই। একত্র থাকিয়া এ ব্রত পালন করিতে পারিব না, দেখিলাম; একত্রে সংসারধর্ম্ম পালন করিব। পিতার গৃহে স্থান না হয়, সংসারে স্থানের কি অভাব? ব্রহ্মচারী এখনই এখানে আসিবেন, তাঁহার অনুমতি লইয়া অদ্য হইতে আমরা পুনরায় গৃহস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিব।"

বাসন্তীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না; চক্ষুর জলে তাহার গণ্ড ও বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল। প্রবোধ বলিল;—

"বাসন্তি, আমি দুর্ব্বলচিত্ত, কাপুরুষ; তাই একাল পর্য্যন্ত শত যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। প্রাণ দিয়াও যদি তোমার পায় কুশের আঘাত বারণ করিতে পারি, আজ হইতে আমি তাহা করিব।"

তখন বিষ ধরিয়া উঠিয়াছিল। বাসন্তী কাতর কণ্ঠে বলিল ;—

"এজন্ম আমার বৃথায় গেল ; তোমার পদসেবা করিব, এমন ভাগ্য লইয়া আসিয়াছিলাম না। আকাশে দেবতারা আশীর্ব্বাদ করুন, আর জন্মে যেন তোমার দাসী হই।"

বিকৃত কাতর কণ্ঠস্বর এবং কথার নৈরাশ্যব্যঞ্জক ভাবে প্রবোধ চমকিয়া উঠিল। তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে ; কিন্তু অন্ধকার সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই। উষার অস্ফুট আলোকে প্রবোধ বাসন্তীর অশ্রুপূর্ণ চক্ষু এবং বিষাদপূর্ণ মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

প্রবোধ দুই হাতে বাসন্তীর দুই হাত একত্র করিয়া ধরিয়া বলিল ;—"বাসন্তি, নিরাশ হইও না। অদৃষ্টে কষ্টভোগ ছিল, এতদিন ভুগিলাম। আজ হইতে এব্রত পরিত্যাগ করিলাম। দেবতা আমাদের সহায় আছেন ; আজ হইতে আমরা নূতন জীবন আরম্ভ করিব।"

বাসন্তী। "আমার অদৃষ্টে সুখ নাই। আমি জন্মদুঃখিনী, সহস্র অপরাধী। আমার অপরাধ মনে রাখিও না। আমি চলিলাম ; তোমার গৃহ আছে, সংসার আছে, যাও। দেবতার কাছে প্রার্থনা করি, আমি চলিয়া গেলে, আমা অপেক্ষা সৌভাগ্যবতী আর কেহ যেন তোমার জীবন সুখময় করে।"

বাসন্তীর কণ্ঠ শুষ্ক, শরীর আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। কথা বলিতে বলিতে ক্লান্ত হইয়া স্বামীর উরুদেশে মাথা নোওয়াইয়া পড়িল। প্রবোধ ভীত কাতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"কি হইয়াছে, বাসন্তি, কেন এমন হইয়া পড়িলে ?"

বাসন্তী। "ক্ষমা করিও ;—বিষ পান করিয়াছি—যাই !"

প্রবোধ উচ্চৈঃস্বরে ইষ্টদেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া, ভূমিতে বিলুণ্ঠিত বাসন্তীর অবসন্ন দেহলতা দুই বাহুতে জড়াইয়া ধরিয়া, কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"বিষ! কেন, বাসন্তি! কি জন্য হঠাৎ বিষ পান করিলে?"

বাসন্তী অতি ক্ষীণ স্বরে বলিল;—

"তুমি বলিয়াছ, আমি কাছে থাকিলে তোমার ব্রত ভঙ্গ হইবে!—চলিয়া যাইব? কোথায় যাইব? তাই, যেখানে গেলে আর তোমার ব্রতের ব্যাঘাত হইব না,—যেখানে গেলে আর সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিব না,—সেই থানে যাইতেছি।—যাইবার সময় একটীবার মাত্র তোমাকে চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া যাই!"

এই বলিয়া স্মিতপ্রফুল্ল অথচ জলভারাক্রান্ত নেত্রে বাসন্তী স্বামীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। প্রবোধ তখন বাসন্তীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিল;—

"যাইও না; একটুকু দাঁড়াও, বাসন্তি; আমিও আসিতেছি।"

এই বলিয়া বাসন্তীর গলদশ্রুধৌতগণ্ড প্রগাঢ় পরিচুম্বিত করিয়া, প্রবোধ তাহার অবসন্ন দেহ মৃগচর্ম্মাসনে রক্ষা করিয়া, দ্রুতবেগে সেই জীর্ণ ইষ্টক মন্দিরে প্রবেশ করিল। প্রবোধও বিষপান করিল!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মন্দির হইতে ফিরিয়া প্রবোধ বাসন্তীর কাছে আসিল। তখন সূর্য্যোদয় হইয়াছে। শত শত নরনারী জাহ্নবীস্নানে আসিতেছিল। প্রবোধ নিজের বাম বাহুতে বাসন্তীর স্কন্ধ রক্ষা করিয়া, তাহাকে অল্প অল্প গঙ্গাজল পান করাইল। বাসন্তী চক্ষু মেলিয়া চাহিল; বলিল;—

"আশীর্ব্বাদ কর, জন্মান্তরে যেন তোমার পদসেবা করিয়া জীবন সার্থক করি।"

প্রবোধ। "যদি পুনর্জন্ম থাকে, দেবতা অবশ্যই আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবেন। তুমি পরমা সাধ্বী, তোমার পুণ্যে আমরা অমরধামে যাইব।"

বাসন্তী। "আমার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইল না! একবার তোমার পদধূলি আমার মাথায় দাও।"

প্রবোধ গলদশ্রুপরিপ্লাবিত মুখে বাসন্তীর ক্রমশঃ নীলিয়মান আরক্ত অধর পরিচুম্বিত করিয়া, স্বহস্তে স্বীয় পদধূলি লইয়া বাসন্তীর মস্তকে প্রদান করিল।

তখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, দুঃখ, যন্ত্রণা, লজ্জা, ভয়, সকল পরিত্যাগ করিয়া, সংসার, ইহলোক সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, উভয়ে অস্ফুট ভগ্নস্বরে ইষ্ট দেবতার নামোচ্চারণ করিতে লাগিল।

ঘাটে উপস্থিত বহুতর নরনারী তখন বৃক্ষমূলে সংযতেন্দ্রিয় যতি দম্পতির এইভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল। পরিশেষে তাহারা ইহাদিগের সমাধির শেষ এবং জীবনের অন্তিম সময় বুঝিতে পারিয়া, সকলে সেই সংজ্ঞাহীনপ্রায় দেহদ্বয় পরিবেষ্টন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে দেবতার নাম কীর্ত্তন

করিতে লাগিল। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দেখিবার জন্য গঙ্গাতটে সেই বটবৃক্ষমূলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বহু লোকের সমাগম হইল।

এমন সময়ে এক ব্রহ্মচারী এবং তাঁহার সঙ্গে এক বৃদ্ধ দম্পতি লোকারণ্য ভেদ করিয়া সেই বৃক্ষমূল-প্রদেশে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আগ্রহের সহিত ইতস্ততঃ চাহিয়া চাহিয়া শেষে সেই নবীন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল; ব্রহ্মচারী মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অতি নিকটে যাইয়া বলিলেন ;—

"প্রবোধ, একি করিয়াছ ?—মা, বাসন্তি, একি ?"

তারপর উচ্চৈঃস্বরে সেই বৃদ্ধ দম্পতিকে বলিলেন ;—

"হতভাগ্য তোমরা!—পুত্র, পুত্রবধূ পাইয়াও পাইলে না ;—ইহাদের আসন্ন সময় উপস্থিত!"

বৃদ্ধ কুসুমহাটীর ত্রিলোচন দত্ত, আর বৃদ্ধা তাহার অভাগিনী স্ত্রী!

সস্ত্রীক কঠোর যতিধর্ম্ম অবলম্বন অপেক্ষা, এ বয়সে প্রবোধের গৃহস্থধর্ম্মাচরণ করা ব্রহ্মচারী শ্রেয় বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পিতার আগ্রহ এবং অভিপ্রায় না হইলে যে প্রবোধ সংসারে ফিরিবে না, তাহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্যই দেশপর্য্যটন উপলক্ষে কুসুমহাটীতে উপস্থিত হইয়া বহুকালের নিরুদ্দেশ পুত্র এবং পুত্রবধূর জীবন সংবাদ প্রবোধের পিতামাতার নিকট দিয়াছিলেন। দত্তমহাশয়ের অভিমান চলিয়া গিয়াছিল। কালে কাহার অভিমান না যায়? ব্রহ্মচারীর নিকট সংবাদ পাইবামাত্র বহুদিনবিসর্জ্জিত পুত্র এবং পুত্রবধূকে গৃহে আনিবার জন্য দত্তমহাশয় সস্ত্রীক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন।

কিন্তু বিধাতার নিয়তিক্রমে সেই নির্ম্মম পিতার উৎকট অভিমানের শোচনীয় পরিণাম এবং নিদারুণ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

হতভাগ্য পিতামাতা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া পুত্র এবং পুত্রবধূর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। প্রবোধের সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল, সে পিতামাতাকে চিনিতে পারিল; হাত বাড়াইয়া তাঁহাদের পদধূলি লইয়া নিজ মস্তকে দিল। বাসন্তির আংশিক চেতনা হইল। নিজ শ্বশ্রূকে চিনিল; পায়ের ধূলা লইবার জন্য হাত বাড়াইতে চেষ্টা করিল;—হাত অবশ! কাহারও কথা ফুটিল না।

পরিশেষে দেখিতে দেখিতে সেই বসন্তপূর্ণিমার প্রভাত সময়ে ভূমিতে বিলুণ্ঠিত, উচ্চৈঃস্বরে রোরুদ্যমান মাতাপিতার সম্মুখে, কাশীবাসী সহস্র নরনারীর সাক্ষাতে, সহস্র দুঃখ যন্ত্রণাময় ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়া সেই নবীন বয়সে প্রবোধ এবং বাসন্তী অনন্তধামে চলিয়া গেল।

হতভাগ্য পিতা—মন্দভাগিনী মাতা আর গৃহে ফিরিলেন না।

শাপে বর

Hamlet. Look here, upon this picture, and on this.

Hamlet.

শাপে বর

(১)

ফাল্গুন মাস, ১২ই তারিখ। কলিকাতা পটলডাঙ্গা নিজবাড়ীর বৈঠকখানায় বসিয়া কৃষ্ণকিশোর দত্ত মহাশয় রামধন বাঁড়ুর্য্যের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। প্রাচীন ভৃত্য বাড়ীর ভিতর হইতে একখানি পত্র আনিয়া দত্তমহাশয়ের হাতে দিল। গোলাপী রঙ্গের খামের ভিতর উৎকৃষ্ট গোলাপী নোট পেপারে সোণালি অক্ষরে মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্র।

খুলিতেই আতর গোলাপের গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া উঠিল। ভৃত্য বলিল ;—

"আপনি আফিসে গেলে পর একটী বাবু আসিয়াছিলেন ; আপনার সাক্ষাৎ না পাইয়া এই চিঠি রাখিয়া গিয়াছেন।"

পত্র পাঠ করিয়া দত্তমহাশয় বলিয়া উঠিলেন ;—

"এতদিনে ভদ্রলোকটার একটা উপায় হইল। মেয়েটীর অদৃষ্ট ভাল। অবশেষে যে এমন বর মিলিবে, তাহা আর মনে করিতে পারি নাই। ছেলেটী দুই বারেও এল, এ, পাশ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু পিতার নূতন কপাল, টাকা কড়ির অভাব নাই।"

রাম। "কাহার কথা বলিতেছেন ?—কাহার মেয়ের বিবাহ ?"

কৃষ্ণ। "শরৎঘোষের মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গিয়াছে; এই ১৫ই তারিখে বিবাহ।"

রাম। "শরৎঘোষ?—কোথাকার শরৎঘোষ?"

কৃষ্ণ। "রামবাগানের শরৎ ঘোষ।"

রাম। "রেলির বাড়ীতে কেরাণী?"

কৃষ্ণ। "হাঁ। রক্ষা পাইল, মেয়ে বার বৎসর পার হইয়াছে। ঘোষজার গলায় ফাঁস পড়িয়াছিল। কিন্তু মেয়েটীর যে এমন কপাল তাহা জানিতাম না।"

রাম। "কোথায় হইল?"

কৃষ্ণ। শিমলের কানাই মিত্রের বড় ছেলের সহিত ঠিক হইয়াছে।"

রাম। "কানাইমিত্র?—তিনি তো খুব বড় মানুষ!—কি পেলেন?"

কৃষ্ণ। "শরৎঘোষ আর বেশি কি দিবেন? রেলির বাড়ীতে একশত টাকা বেতন পান; তিনটী মেয়ে; তাঁহার আর দিবার কি শক্তি? কথা বার্ত্তার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম;—মেয়ের গহনা হাজার টাকার, ছেলের যৌতুক পত্র, আর নগদ দুই হাজার টাকা।"

রাম। "এই মাত্র?"

কৃষ্ণ। "এইমাত্র, কি মহাশয়! এতেই ঘোষজার পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে।"

রাম। "আমি তাহা বলিতেছি না; পাঁচ হাজার টাকা ক'জনে খরচ করিতে পারে?—তবে, শুনিয়াছিলাম, মিত্রজা নগদ পাঁচ হাজার টাকার নীচে নামিবেন না।"

কৃষ্ণ। "শরৎঘোষের মেয়েটী বড় সুন্দরী, বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছে। এমন মেয়ে সকল সময় পাওয়া যায় না। শুনিয়াছি, মেয়েটির রূপগুণের কথা কানাইবাবুর পুত্র যেন কেমন জানিতে

পারিয়াছে। পুত্রের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া কানাইবাবু অবশেষে এ সম্বন্ধে রাজী হইয়াছে, কিন্তু গিন্নীর ভারি অমত।"

রাম। "কেন?"

কৃষ্ণ। "গিন্নীর পাইবার আকাঙ্ক্ষা খুব বেশী। শরৎবাবু দ্বারা তাহা মিটিবার ভরসা একেবারেই নাই।"

রামধন বাঁড়ুর্য্যে সেখান হইতে উঠিয়া বরাবর হোঁগলকুড়ে নারায়ণী ঠাকুরাণীর বাড়ীতে গেলেন। নারায়ণী ঠাকুরাণী ঘটকতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন; গিন্নীমহলে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি। রামধন তাঁহারই একজন চর, লাভের অঙ্কে রামধন অংশ পাইতেন।

---

(২)

কানাইবাবু নূতন বড়মানুষ; ওকালতি করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন; দেশভরা তাঁহার প্রতিপত্তি। পরদিন বিকাল বেলায় কোর্টের ফেরতা স্বামীকে জল খাবার দিয়া গৃহিণী বলিলেন;—

"হাঁ গা, বিহারির সম্বন্ধ কি একেবারে পাকাপাকি ঠিক করিয়াছ?"

কানাই। "তাহা কি আর তুমি জান না? বুধবার বিবাহ; মধ্যে আর দুই দিন মাত্র বাকী আছে। আজ আবার একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? নিমন্ত্রণপত্র পর্য্যন্ত বিলি হইয়াছে, সমস্ত আয়োজন ঠিক ঠাক। বাকীপুর হইতে সদু আর জামাতাকে আসিতে লিখিয়াছি। দুই একদিন মধ্যে বর্দ্ধমান হইতে অতুল আসিবে। ঘরবাড়ী মেরামত, চূণকাম শেষ।—আজ আবার একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

গৃহিণী। "আমি শরৎঘোষের মেয়ের সঙ্গে বিহারির বিবাহ দিব না।"

কানাই। "সে কি! কথা দিয়াছি, পাকা দেখা হইয়াছে, এখন কেমন করিয়া ফিরিব?"

গৃহিণী। "আমি তা জানি না। আমি একাজ করিব না। দুই হাজার টাকার গহনাও শরৎঘোষ দিতে পারিবে না, শুধু এক নোলক-পরা মেয়ে আমি ঘরে আনিব না।"

কানাই। "শরৎঘোষ এক হাজার টাকার গহনা দিবে, ছেলের যৌতুকপত্র সাধ্যমত দিবে, নগদ দু হাজার টাকা দিবে;—মন্দই বা কি?"

গৃহিণী। "ভাল তো খুব! বিনোদঘোষের মেয়ের সঙ্গে কর না কেন? তিন হাজার টাকার গহনা দিবে, সোণার ঘড়ি, জড়োয়া চেইন দিবে, নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিবে।"

কানাই। "কালো মেয়ে!"

গৃহিণী। "সোণা মণি মুক্তার গা ঢাকিয়া দিবে।"

কানাই। "মেয়ে কালো; দুদিন পরে বাড়ীতে কালো পায়রার ঝাঁক্ বসিবে।"

গৃহিণী গৌরাঙ্গী ছিলেন না, বলিলেন;—

"তেমন কালো নয়; আর, মা কালো হইলেই সকল সময় ছেলে মেয়ে কালো হয় না।"

কানাই। "সে মায়ের গুণে নহে!"

গৃহিণী নিজেকে আহত জ্ঞান করিলেন; রাগে গর গর করিয়া উঠিলেন;—

"আমি একাজ করিব না; কাঙ্গালী দেখিয়া যদি দয়া হয়, হাজার টাকা খয়রাত কর। আমি গরীব কাঙ্গালের মেয়ে ঘরে আনিয়া ঘর হাল্‌কা করিব না।"

গৃহিণী অভিমানে সে স্থান ত্যাগ করিয়া শয্যার আশ্রয় লইলেন। পূর্ব্বদিন কানাইবাবু কোর্টে গেলে পর নারায়ণী ঠাকুরাণী গিন্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বিনোদঘোষ তিন হাজার টাকার গহনা, হীরার আঙ্গটি, চেইন, নগদ চারি হাজার টাকা দিবে; বারো মাসে তের তত্ত্ব, পঞ্চাশ জন ঝি চাকরের কমে এক তত্ত্ব যায় না!—ঘোষেদের সাত খানা বাগানবাড়ী; মেয়ের বাড়ীর বারমাসের মাছ তরকারী, ফল-ফলারির ভাবনা কি?—কত কথা! মেয়েটী কিছু কালো, কালোই বা কি? জলপাইর রঙ্গ; কাণে একটুকু দোষ আছে, তাতে কি আসে যায়?—সোণা গয়না, মণিমুক্তা, সাচ্চা কামদার সাড়ী, জ্যাকেট পরিয়া বৌ যখন ঘরে ঢুকিবে, লোকে দেখিবে, আর বলিবে, স্বর্গ হইতে পরী নেমে এসেছে!—শুনিয়া শুনিয়া গৃহিণীর গা ফুলিয়া উঠিয়াছিল। খাটবিছানা, বাক্স তোরঙ্গ, বাসনপত্র, তামাকাঁসা, সোণারূপা ভারে ভারে যখন ঘরে আসিবে, লোকে মনে করিবে, কুবেরের ভাণ্ডারে ছাড়-পত্র পেয়েছ! শুনিয়া শুনিয়া গৃহিণীর চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল।—এখনো সময় আছে; তাহারা বড়মানুষ, দুদিনে সকল জোগাড় করিতে পারিবে। ছেলের মামারা আরও বড়মানুষ,—জমিদার। লোকজন, চাকর চাকরাণী, গাড়ীঘোড়া, হাতী পাল্কী——"

গৃহিণী বলিয়া ছিলেন;—

"কি করি! কর্ত্তাটী বুঝেন্ না! কথা দেওয়া হইয়াছে।"

নারায়ণী। "কত যায়গায় কথা ভাঙ্গিয়া যায়, তাতে কি দোষ আসে?—সাহেববাড়ীর তৈরি গহনা, জয়পুরের পাথরের বাসন, কাশ্মিরী শাল, বোম্বাই——"

গৃহিণী। "তা, ঘটক ঠাক্‌রুণ, তোমার আর একটুকু দেখিতে হইবে. নগদ তিন হাজারে হইবে না। বিনোদ ঘোষ যদি পাঁচ——

নারায়ণী। “পাঁচ হাজার? তার জন্য আপনি ভাবিবেন না।”

গৃহিণী। “বিনোদবাবু যদি নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে এই কার্য্যই করিব।”

নারায়ণী। “আমি আজই তাঁহাকে স্বীকার করাইব। আপনি এদিকে ঠিক ঠাক্ করুন, আমি কাল আসিয়া খবর দিব। দেখিবেন. কথা যেন নড়ে না।”

ঘটক ঠাকরুণের কথায় গিন্নী ফিরিয়াছেন, গিন্নীর কথায় কানাই বাবু ফিরি-ফিরি হইলেন। তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইল। মেয়ে একটুকু কালো, কিন্তু তিন হাজার টাকার গহনা, পাঁচ হাজার টাকা নগদ! ভাবিয়া দেখার বিষয় বটে। এদিকে শরৎবাবুর সঙ্গে কথা বার্ত্তা ঠিক হইয়াছে, আয়োজন উদ্যোগ শেষ হইয়াছে; কি বিপদ!

কানাই বাবু বড় ভাবনায় পড়িলেন।

পরদিন ও নারায়ণী ঠাক্রুণ আসিয়াছিলেন।

---

(৩)

আজ ১৫ই তারিখ। বাবু শরৎচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে ভারি ধুম। কন্যা কুসুমকুমারীর বিবাহ। কুসুমের অদৃষ্টে ভাল বর জুটিয়াছে। কানাই বাবু বড়মানুষ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত কার্য্য। শরৎবাবু সর্ব্বস্ব পণ করিয়া আয়োজন করিয়াছেন। বেহাই, বিশেষতঃ বেহাইন ঠাক্রুণের মন রাখিতে হইবে, যাহাতে কুসুম তাঁহাদের সুনজরে পড়ে, তাহা করিতে হইবে; বিষয় সহজ নহে। যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল, তাহা গেল; অনেক টাকা ঋণ করিতে হইল। মাথার বোঝা নামাইতে লোক ব্যস্ত, ভবিষ্যৎ ভাবিবার সময় কই? ঘরবাড়ী সুসজ্জিত

হইয়াছে, অতিরিক্ত চাকর চাকরাণী নিযুক্ত হইয়াছে। আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধবে গৃহ পরিপূর্ণ। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সমস্ত গৃহ আলোকিত হইয়াছে, রোসনচৌকী বসিয়াছে। রাত্রি চারিদণ্ড পরেই লগ্ন; বর আসিবার বিলম্ব নাই। বালক বালিকারা শাঁখ লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে, ফুটপাথের বারান্দায় দাঁড়াইয়া বরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। যুবতীরা কুসুমকে সাজাইতেছেন; পাণ খাইতেছেন, একে আড় চক্ষে অপরের অলঙ্কারের সংখ্যা এবং কারু কার্য্য লক্ষ্য করিতেছেন, মৃদুহাস্য পরিহাসে ভিতরবাড়ী কোলাহলময় করিতেছেন, আয়ত চক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টি প্রসারে, দীপালোকে ঝলমলায়মান স্বর্ণালঙ্কারের চকিত জ্যোতিতে চারিদিকে বিদ্যুৎবিকাশ করিতেছেন। বৃদ্ধারা ভাঁড়ার ঘরের তত্ব করিতেছেন, চাকরাণী দিগকে শাসাইতেছেন, মেয়ের বাসন পত্র, বিছানা পাতি, যৌতুক সামগ্রীর শৃঙ্খলা করিতেছেন।

ক্রমে নিমন্ত্রিতেরা উপস্থিত হইলেন। কন্যা-পক্ষীয় সকলেই আসিলেন; বর পক্ষেরও যাঁহারা ভবানীপুর, বরাহনগর প্রভৃতি দূর অঞ্চলের লোক, তাঁহাদের কেহ কেহ বরের বাড়ীতে না গিয়া বরাবর ক'ণের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষের লোকদিগকেই আদর অভ্যর্থনা, আহার ইত্যাদি করান হইতে লাগিল। কিন্তু এখনো বর আসিয়া পৌঁছিল না। লগ্নের সময় উপস্থিত, বর পৌঁছিল না। কন্যার আত্মীয়েরা রাস্তায় দাঁড়াইয়া, অগ্রসর হইয়া, বরযাত্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। লগ্নের দিনে কলিকাতায় গলিতে গলিতে বিবাহ। শরৎবাবুর লোকেরা কোন মিশিল আসিতে দেখিলেই অভিবাদনের জন্য অগ্রসর হন, কিন্তু বর তাঁহাদের নয়, বরাবর চলিয়া যায়! মহা বিপদ।

লগ্ন অতীত প্রায় হইল। তখন এক জন আত্মীয় গাড়ী করিয়া

দ্রুত বেগে কানাই ঘোষের বাড়ীতে তত্ত্ব করিতে চলিলেন। পাড়ার সম্ভ্রান্ত ধনী বুনেদি জমিদার বাবু দেবেন্দ্রনাথ মিত্র নিমন্ত্রিতগণের আহারাদির তত্ত্বাবধানে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবেশীর বাড়ীতে ব্যাপার, তিনি প্রাণপণে খাটিতেছেন, তাহার যত্ন চেষ্টায় কোন বিষয়ে কোন রূপ অসুবিধা হইতেছে না। লগ্ন অতীত হইল, লোকে নানা সন্দেহ করিতে লাগিল। কে যেন বলিল ;—

"শুনিয়াছি, হাটখোলার বিনোদ বাবুর মেয়ের সঙ্গে কানাই ঘোষ ছেলের সম্বন্ধের প্রস্তাব চালাইতেছে।"

শুনিয়া দেবেন্দ্র বাবু বলিলেন ;—

"সে কথা আমরাও শুনিয়াছি। প্রস্তাব তো অনেক যায়গায়ই চলিয়া থাকে। কানাই বাবু বিশিষ্ট লোক, তাঁহার কথা নড়চড় হইবার নয় ; দেখ, তাঁহাদের হঠাৎ কোন বিপদ হইয়াছে কি না।"

কানাই মিত্রের বাড়ীতে যে লোক গিয়াছিলেন, এমন সময় তিনি ফিরিলেন। তাঁহার মুখে প্রকৃত কথা বুঝা গেল।—কানাই ঘোষ এ কার্য্য করিবেন না, তাঁহার ছেলের নাকি ইচ্ছা নাই।—বিনোদ ঘোষের মেয়ের সঙ্গে কার্য্য ঠিক করিয়াছেন, আগামী পরশ্ব বিবাহ!

শুনিয়া সকলের মাথায় বজ্রপাত হইল। যে যেখানে ছিল, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। বালক বালিকারা সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল ; যুবতীদের হাস্য পরিহাস থামিয়া গেল, প্রফুল্লমুখ পরিম্লান হইয়া উঠিল ; বৃদ্ধারা কাঁদিয়া ফেলিলেন ; রোসনচৌকি থামিয়া গেল ; আহারের স্থানে ভদ্র লোকেরা হাত তুলিয়া বসিলেন ; পরিবেশন বন্ধ হইল ;—এই অভাবনীয় বিপদপাতে সমস্ত বাড়ী স্তম্ভিত হইল।

ভিতর বাড়ীতে গৃহিণী আছাড় খাইয়া সম্বিৎ শূন্য হইয়া ভূমিতে

পড়িলেন। বৈঠকখানায় শরৎ বাবু বাতভঙ্গের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ফরাসের উপর পড়িয়া গেলেন। লোক জন চারিদিক হইতে ছুটাছুটি করিয়া আসিতে লাগিল। দেবেন্দ্র বাবুও সেখানে গেলেন। লজ্জায় অপমানে তাঁহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইয়াছে, চক্ষু আরক্ত হইয়াছে। যে আত্মীয়টী কানাই বাবুর বাড়ীতে গিয়াছিলেন, দেবেন্দ্র বাবু তাঁহাকে পুনরায় ডাকাইয়া সকল কথা শুনিলেন। তখন আর কোন সন্দেহ রহিল না। কানাই বাবু প্রকৃতই এ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া টাকার লোভে বিনোদ বাবুর মেয়ের সঙ্গে পুত্রের বিবাহ স্থির করিয়াছেন। আজ বিকালে কথা শেষ ঠিক করিয়াছেন ; এবাড়ীতে অবস্থা জানানের ভার মধ্যবর্ত্তী ঘটকের প্রতি দিয়াছিলেন ; বোধ হয়, অপমানের ভয়ে ঘটক এদিকে আসে নাই। শুনিয়া দেবেন্দ্র বাবু কিয়ৎকাল স্পন্দহীন চক্ষে জানালার দিকে চাহিয়া রহিলেন ; শেষে বলিলেন ;—

"শরৎবাবু, উঠ, উঠ।"

শুষ্ককণ্ঠ শরৎ বাবু উত্তর দিতে পারিলেন না। তাহার জলভরা রক্তচক্ষু দেখিয়া সকলে মর্ম্মাহত হইল।

দেবেন্দ্র। "শরৎ বাবু, উঠিয়া ব'স।"

শরৎ। "আমার জাতি কুল সব গেল!—আমার উপায় কি হইবে ?"

দরবিগলিত অশ্রুধারে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। দেবেন্দ্র বাবু আরও একটুকু অগ্রসর হইলেন।

দেবেন্দ্র। "আমার একটী কথা রাখিবে ?"

শরৎ। "কি কথা ?—আমি কি আর মানুষের মধ্যে আছি ?"

দেবেন্দ্র। "শচীন্দ্রের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ দিবে ?"

শরৎ। "শচীন্দ্র !"

দেবেন্দ্র। "আমার ছেলে; তাহার সঙ্গে করিবে?"

শরৎ। "আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র শচীন্দ্র! আপনি কি বলিতেছেন?"

দেবেন্দ্র। "বলিতেছি, আগ্রহ করিতেছি; যদি তোমার অনভিমত না হয়, তবে আজ রাত্রিতেই তোমার কন্যার সঙ্গে শচীন্দ্রের বিবাহ দিব।"

শরৎবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, উচ্ছ্বসিত গদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন;—

"দেবেন্দ্র বাবু, আমার কি ভাগ্য যে, আমি এই দুরাশা করিতে সাহস করি?"

দেবেন্দ্র। "দুরাশা কিছু মাত্র নহে, শরৎবাবু। তোমার সঙ্গে কার্য্য কোন রূপেই আমার অকরণীয় নহে। তুমি কায়স্থের চূড়া. প্রধান কুলীন; তোমার কন্যা পরমাসুন্দরী, তোমার স্ত্রীপুত্র কন্যা পরিজন সমস্ত আমার বাড়ীতে সকলের পরিচিত। এমন সৎবংশে, সৎলোকের পরমা সুন্দরী কন্যার সঙ্গে আমার পুত্রের বিবাহ আমি সৌভাগ্যের———"

শরৎবাবু আর থাকিতে পারিলেন না, দেবেন্দ্র বাবুর পদতলে পড়িলেন। দেবেন্দ্রবাবু সসম্ভ্রমে তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবেরা শরৎবাবুর ভাগ্যচক্রের সহসা এই শুভ পরিবর্ত্তন দেখিয়া উল্লসিত হইলেন। দেবেন্দ্রবাবু তখন সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন;—

"শরৎবাবুর আত্মীয় কুটুম্ব, আমার নিজের আত্মীয় কুটুম্ব, অন্যান্য ভদ্র ব্রাহ্মণ, যাঁহারা আজ এবাড়ীতে উপস্থিত আছেন, আমি সকলকেই মিনতি করিয়া জানাইতেছি, আজ রাত্রিতেই শরৎবাবুর কন্যা শ্রীমতী কুসুমকুমারীর সহিত আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান শচীন্দ্রনাথের শুভ বিবাহ; আপনারা উপস্থিত থাকিয়া আমার এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া আমাকে চির-অনুগৃহীত করিবেন।"

সমস্ত ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিতচিত্তে একবাক্যে মঙ্গল উচ্চারণ করিয়া উঠিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে বহির্ব্বাটী, ভিতরবাটী সকল স্থানে এই সুসমাচার প্রচারিত হইল। শাঁখ বাজিয়া উঠিল, হুলুধ্বনি পড়িল, রৌসনচৌকি বাজিয়া উঠিল।

দেবেন্দ্রবাবু তখন শরৎবাবুকে লইয়া ভিতর বাটীতে প্রবেশ করিলেন। বিবাহোচিত বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিতা, কুটুম্বিনী-পরিবৃতা কন্যা যে গৃহে বসিয়াছিল, দেবেন্দ্রবাবু সেইখানে গেলেন। এমন সাহস, এমন চিত্ত যাঁহার, তাঁহাকে দেখিবার জন্য বৃদ্ধা, যুবতীরা পর্য্যন্ত লজ্জা ভুলিয়া অগ্রসর হইলেন।

দেবেন্দ্র। "শরৎবাবু, অনেকবার তোমার কন্যাকে দেখিয়াছি, এখন আর একবার দেখিব।"

নিকটে একজন প্রাচীনা আত্মীয়া ছিলেন, তিনি কুসুমের হাত ধরিয়া দেবেন্দ্র বাবুর কাছে আনিলেন; তাঁহার উপদেশ মতে কন্যা কুসুমকুমারী দেবেন্দ্র বাবুকে প্রণাম করিল।

"দেখি, মা।"—বলিয়া দেবেন্দ্রবাবু স্বয়ং ভাবী পুত্রবধূর মুখাবরণ উন্মুক্ত করিলেন। কুসুম কৈশোরসীমান্তে পা দিয়াছে। বিকশৎ কমলকুসুমের মত তাহার গৌরমুখমণ্ডল স্নিগ্ধ বিশদ পবিত্র লাবণ্যে দীপ্তি পাইতেছিল। দেবেন্দ্রবাবু পকেট হইতে একটা মণিব্যাগ বাহির করিলেন এবং তাহার মধ্য হইতে একটী গিনি এবং কুড়ি টাকার এক খানি নোট বাহির করিয়া কুসুমের হাতে দিলেন; বলিলেন;—

"আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, মা, আজ হইতে তুমি আমার স্ত্রীপুত্র কন্যা আত্মীয় পরিজনের আনন্দবর্দ্ধিনী এবং আদরভাগিনী হইয়া আমার গৃহের শ্রীবৃদ্ধি করিবে।"

চারিদিকে শঙ্খ-ধ্বনি হইল, হুলুধ্বনি পড়িল। আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন

করিতে করিতে দেবেন্দ্রবাবু বাহির বাটীতে আসিলেন। সে মুহূর্ত্তে ভিতর বাটীতে কাহারও চক্ষু অনশ্রুপরিপ্লুত রহিল না।

"রাত্রি আড়াইটার সময় আর এক লগ্ন আছে; তৎপূর্ব্বেই আমি বর লইয়া আসিতেছি।"—বলিয়া দেবেন্দ্রবাবু নিজের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

যে সকল লোক কানাইবাবুর নিমন্ত্রণে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার উদ্দেশ্যে অকথ্য গালাগালি দিয়া লজ্জায় অভিমানে কেহ ভুক্ত, কেহ অভুক্ত, সে বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন।

---

(৪)

সেই পল্লীতে নিকটেই দেবেন্দ্রবাবুর বাড়ী। ফুলের বাগান, পুষ্করিণীযুক্ত বৃহৎ কমপাউণ্ড; প্রকাণ্ড অট্টালিকা। দেবেন্দ্রবাবু ধনী ও জমীদার। তাঁহার জেষ্ঠপুত্র শচীন্দ্র এবার প্রেসিডেন্সি কলেজে তৃতীয় বার্ষিকী শ্রেণীতে পাঠ করে, বয়স এই কুড়ি বৎসর, রূপবান, পবিত্রস্বভাব, মাতা পিতার আজ্ঞাকারী। বড় মানুষের ঘরে এমন চরিত্রবান ছেলে দুর্লভ। দেবেন্দ্রবাবু এবৎসর তাঁহার প্রথমা কন্যা রাজলক্ষ্মীর বিবাহে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। দ্বিতীয়া কন্যা সুভাষিণীও বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, তাহার বিবাহের জোগাড় পত্র করিতেছিলেন। শচীন্দ্রের বিবাহ আগামী বৎসর দিবেন মনে করিয়াছিলেন; ছেলেরও অভিপ্রায়, বি, এ পাশ করিয়া বিবাহ করে। কিন্তু ঘটনা চক্রে পিতা আজ রাত্রিতেই তাহার বিবাহ দেওয়া ঠিক করিলেন। বাড়ীর দরজায় পৌঁছিয়াই দেবেন্দ্রবাবু গাড়ী সাজাইয়া আনিবার আদেশ দিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর লোকজন

সকলকে ডাকাইলেন। পাশের ঘরে শচীন্দ্র পড়িতেছিল, তাহাকে ডাকাইলেন। সকলের সাক্ষাতে পুত্রকে বলিলেন ;—

"বাবা শচীন্দ্র, তোমার বিবাহ আগামী বৎসর দিব, মনে করিয়া ছিলাম, কিন্তু আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। আজ রাত্রিতেই তোমার বিবাহ !"

শচীন্দ্রের মাতুল অনিলবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; তিনি বলিলেন ;—

"আজ রাত্রিতেই ! কেন ? কি হইয়াছে ?"

দেবেন্দ্র। "কি হইয়াছে, তাহা ক্রমে শুনিতে পাইবে। পাড়ার শরৎচন্দ্র ঘোষের মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করিয়া পাকা দেখা সারিয়া আসিলাম। তোমরা বরযাত্রর আয়োজন কর।"

অনিল। "দিদি জানেন ?"

দেবেন্দ্র। "এখনি তাঁহাকে জানাইব। শরৎ বাবু শ্রেষ্ঠ কুলীন, ঘোষপরিবার চরিত্রে ব্যবহারে আদর্শস্থানীয় ; তাঁহার কন্যা কুসুম পরমা সুন্দরী ; মেয়েটী অনেক দিন আমাদের রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে খেলা করিতে এবাড়ীতে আসিয়াছে, তোমরা সকলেই তাহাকে দেখিয়াছ। এমন সুন্দরী মেয়ে আজ কাল পাওয়া যায় না। আমি তাড়াতাড়ি সম্বন্ধ ঠিক করিয়াছি বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন খুঁৎ নাই। তোমরা প্রস্তুত হও।"

দেবেন্দ্র বাবু ভিতর বাড়ীতে গেলেন। বেচারী শচীন্দ্র অবাক্ ! কোন খবর নাই, নিদ্রা হইতে চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিতেই বিবাহ !

কিন্তু শচীন্দ্র অনেকবার কুসুমকে দেখিয়াছে। ছোট বোন্ রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে কুসুমের বড় ভাব। আগে আগে প্রায়ই কুসুম সে বাড়ীতে আসিত, বিবাহযোগ্যা হইবার পরে আর আসে নাই। এক-বারমাত্র রাজলক্ষ্মীর বিবাহের সময় আসিয়াছিল, সে আজ তিন মাস

হইল। শচীন্দ্র তখনও তাহাকে দেখিয়াছিল; দেখিয়া রাজলক্ষ্মীকে বলিয়াছিল;—

"রাজু, কুসুম তো খুব সুন্দরী হইয়া উঠিল!"

রাজলক্ষ্মী বলিয়াছিল;—

"দাদা, কুসুমের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইলে খুব মানায়!"

শচীন্দ্র বলিয়াছিল;—"দূর্ পাগ্‌লী, চুপ!"—আজ কি না তাই হইতে চলিল!

রাজু কি বাবাকে কিছু বলিয়াছে না কি?

শচীন্দ্রের মাতা ও কতদিন মনে করিতেন, কুসুমের মত একটা সুন্দরী মেয়ে ঘরে আনিতে পারি, তবে আমার সাধ পূর্ণ হয়। কিন্তু কুসুমের পিতার অবস্থা ভাল নয়, কেমন করিয়া কি হইবে?—মাতা আজ দুই বৎসর হইল কাহাকে ও না জানাইয়া (শুধু স্বামীর কাণে কাণে বলিয়াছিলেন মাত্র!) ঘটক ঠাকুরাণীকে ভাল মেয়ে খুঁজিবার অনুমতি দিয়াছেন। অনেক মেয়ের রূপগুণের সংবাদ পাইয়াছেন। মাতার হৃদয়, পুত্র জন্মিলেই তাহার বিবাহ দিয়া ঘরে বৌ আনিবার সাধ জন্মে! পুত্র পাঁচ বৎসরের হইলেই অনেক মাতা ভাবেন, বাছা যাহাকে বিবাহ করিবে, এতদিন বা সে কোথায়ও কাহার ঘরে জন্মিয়াছে! স্বামীর মুখে সেই কুসুমের সঙ্গেই পুত্রের বিবাহ স্থির এবং আজ রাত্রিতেই বিবাহ শুনিয়া গৃহিণী চমকিয়া উঠিলেন।

গৃহিণী। "সে কি গো! আজ রাত্রিতেই?"

স্বামী। "আমি ঠিক করিয়া আসিয়াছি, তুমি আপত্তি করিও না; তাহা হইলে আমার মান থাকিবে না।"

স্বামী সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন;—"দেখ, মেয়ে ভাল, বংশ ভাল, সৎ পরিবার; তুমি আপত্তি করিও না।"

গৃহিণী। "আপত্তি করিবার সময় কি আর আমাকে দিলে ?"

স্বামী। "তা সত্য; আমার সে অপরাধ লইও না। তুমি স্বীকার হও।"

গৃহিণী হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন;—"স্বীকার না হইলে কি করিবে ?"

স্বামী। "স্বীকার না হইলে—"

দেবেন্দ্রবাবু সেই আধবয়সী গৃহিণীর গাল টিপিয়া দিলেন।

গৃহিণী। "ছেলের বিবাহ দিতে বসিয়া এ বয়সে নিজে রসে উথলিয়া উঠিলে দেখ্‌ছি!"

স্বামী। "তোমার বিবাহের কথা মনে পড়িতেছে!—উঠ, বর যাত্রার আয়োজন কর।"

গৃহিণী। "যার বিবাহ তাকে বলিয়াছ তো? শচীন্দ্র কি মনে করিবে ?"

স্বামী। "সে স্বীকার হইয়াছে।"

গৃহিণী। "রাজলক্ষ্মীকে আনাইবে না ?"

স্বামী। "জামাই মেয়েকে আনিবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়াছি। বেহাই কাল আসিবেন। আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে কাল আনাইব। আমি বাহিরে যাই; তুমি শচীন্দ্রকে যাত্রা করাও।—আর একটা কথা। সুভাষিণীর গহনা গুলি আমাকে দাও!"

গৃহিণী বুঝিতে পারিলেন, হাসিলেন; বলিলেন;—
"তা বেশ; কিন্তু কাল বৌ ঘরে আসিবে, সুভাষিণী খালি গায়ে থাকিবে ?"

স্বামী। "কাল দিনের মধ্যেই একটা জোগাড় করিব।"

গৃহিণী তখন লোহার সিন্দুক খুলিয়া সুভাষিণীর জন্য প্রস্তুত গহনা সমেত দুইটী ছোট বাক্স বাহির করিয়া স্বামীর হাতে দিলেন।

(৫)

রাত্রি প্রায় দুইটার সময় দেবেন্দ্রবাবু বর লইয়া শরৎবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অত রাত্রিতে মিশিল, সাজ সজ্জা কিছুরই জোগাড় হয় নাই, কিন্তু পর দিন বধূ ঘরে আনিবার বিপুল আয়োজনের বন্দোবস্ত দেবেন্দ্রবাবু করিয়াছেন। বরকে বৈঠকখানায় বসাইয়া দেবেন্দ্রবাবু শরৎবাবুকে লইয়া ক'ণের ঘরে গেলেন। শরৎবাবু নিজের অবস্থানুসারে কন্যার গহনা পত্র খুব ভালই দিয়াছিলেন ; হাজার টাকার গহনা খেলা-খেলার বিষয় নয়। দেবেন্দ্রবাবু সঙ্গে আনীত বাক্স দুটী খুলিয়া হীরা মণি মুক্তা জড়িত অনেক গহনা বাহির করিলেন। কুসুমের গা হইতে তাহার পিতৃদত্ত প্রায় সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া লইলেন ; কেবল কাণের ইয়ারিং, গলার এক ছড়া হার আর হাতের বালা ও লোহা খুলিলেন না। তখন সেই নূতন আনীত বহুমূল্য স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারে কতক নিজ হস্তে, কতক অপরের হস্তে, কুসুমকে আপাদ মস্তক সাজাইয়া সাশ্রুস্নিগ্ধনেত্রে তাহার সজ্জিত পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্র। "শরৎবাবু, বসন্ত কৈ? তোমার দ্বিতীয়া কন্যা বসন্ত কোথায়?"

বসন্তকুমারী দিদির পশ্চাতে জড়সড় হইয়া ছিল, শরৎবাবু তাহার হাত ধরিয়া সম্মুখে আনিলেন এবং দেবেন্দ্র বাবুকে প্রণাম করাইলেন। বসন্তও বড় হইয়াছে, শীঘ্রই তাহারও বিবাহ দিতে হইবে। দেবেন্দ্রবাবু তখন কুসুমের শরীর হইতে খোলা সেই সহস্র টাকার গহনা একে একে বসন্তকে পরাইতে লাগিলেন।

শরৎবাবু বলিলেন ;—"এ কি করিতেছেন ?'

বসন্ত সঙ্কুচিত শরীরে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। দেবেন্দ্রবাবু বসন্তকে সাজাইতে ব্যস্ত।

শরৎ। "দেবেন্দ্রবাবু, একি করিতেছেন ? আমি—"

দেবেন্দ্র। "এ সকল গহনা তুমি কুসুমকে দিয়াছ ?"

শরৎ। "ইহার বেশি দিবার সাধ্য আমার কেমন করিয়া হইবে?"

দেবেন্দ্র। (হাসিয়া) "হাজার টাকার গহনা দিয়াছ, শরৎ-বাবু; হাজার টাকা তামাসার বিষয় নহে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে এবং তোমাদের অনুগ্রহে আমার পুত্রবধূকে আমি অলঙ্কারে সাজাইতে পারিব। বসন্ত বড় হইয়াছে, এখন ইহারও চেষ্টা দেখিতে হয়। আমি বসন্তকে এই সমস্ত গহনা দিলাম।——এ দানে আমার পুত্রবধূ পরম সুখী হইবে।"

বিহ্বল হইয়া সকলে দেবেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আবলবৃদ্ধবনিতা সকলের চক্ষুতে জল আসিল।

নির্দ্ধারিত লগ্নে শচীন্দ্রের সঙ্গে কুসুমের বিবাহ হইয়া গেল।

এই ঘোর কলিতেও বঙ্গের পৈশাচীক বিবাহ ক্ষেত্রে সময় সময় দেবতার আবির্ভাব দেখা যায়!

মৃণালিনীর দৌত্য

"পরস্পরেণ স্পৃহণীয় শোভং

নচেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ !"

কুমারসম্ভব।

"কিংকুলেন বিশালেন গুণহীনস্তু যো নরঃ।
অকুলীনোঽপি শাস্ত্রজ্ঞো দৈবতৈরপি পূজ্যতে॥
রূপযৌবনসম্পন্না বিশালকুলসম্ভবা।
বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধাইব কিংশুকাঃ॥"

মৃণালিনীর দৌত্য

(১)

সূত্রপাত

রমেশচন্দ্র রায় এম, এ ; কলিকাতা—কালেজের একজন বিখ্যাত নবীন অধ্যাপক। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার অধ্যাপনার খ্যাতি চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আজ তাঁহার গৃহে এক অতিথি উপস্থিত। অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—রমেশচন্দ্রের মাস্‌তুত ভাই, বয়সে তিন বৎসরের ছোট। অতুলও শিক্ষিত ; বি, এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নাগপুরে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছেন। দুই ভ্রাতায় পরম সৌহার্দ্দ। আদালত বন্ধ উপলক্ষে অতুল কলিকাতায় রমেশচন্দ্রের বাড়ী আসিয়াছেন। কলিকাতায় আসিলে রমেশচন্দ্রের বাড়ীই তাঁহার স্থান। দূরে দূরে থাকা সময়ও প্রায় প্রতি সপ্তাহে পরস্পরের নিকট চিঠি পত্র চলে। দুইজনের মধ্যে গাঢ় প্রণয়।

রবিবার দিন বিকাল বেলায় দুই বন্ধু রমেশচন্দ্রের দ্বিতল শয়নগৃহে বিস্তৃত খাটের উপর বসিয়া পাণ খাইতেছিলেন, এবং আলাপ করিতেছিলেন। রমেশচন্দ্রের স্ত্রী নলিনীসুন্দরী গৃহের এক কোণে জানালার পাশে বসিয়া আরও পাণ সাজিতেছিলেন। বিকালে পুরা এক ডিবা

পাণ না হইলে রমেশচন্দ্রের তৃপ্তি হয় না। শয়নগৃহে বসিয়া সংসার-সঙ্গিনীর স্বহস্ত-সজ্জিত দুই একটি পানে ওবয়সে কাহারই বা তৃপ্তি হইয়া থাকে? গৃহে বয়োজ্যেষ্ঠ দেবর, সুতরাং নলিনীসুন্দরী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছিলেন। দুই বৎসরের খোকা শয্যার একপাশে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল।

শয্যাপার্শ্বে দেয়ালের গায় সুন্দর ফ্রেমে বাঁধা কয়েকখানি ফটোগ্রাফ ছিল। সেগুলির প্রতি দৃষ্টি করিয়া অতুলচন্দ্র বলিলেন;—

"দাদা, ছবি তুলিলে কবে?—এখানি তো তোমার ছবি; মধ্যের এ খানি তো খোকা! খোকার ছবি খানি বেশ উঠিয়াছে;—মাথাভরা চুল, মুখভরা হাসি!—খোকার হাতে এটা কি?"

রমেশ। "ওটা তোমার বধূঠাকুরাণীর সোণার কাণ।"

অতুল। "সোণার কাণ! কেন? অভাব পূরণার্থে নাকি? সেই জন্যই কি অত খানি ঘোমটা দিয়া মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছেন?"

নলিনীসুন্দরী আসীমন্ত অবগুণ্ঠন আরও টানিয়া নামাইলেন।

রমেশ। "না হে, তা বলিতে পারিবে না! অমন সুন্দর কাণ যার তার নাই। মা আদর করিয়া মতি বসান সুন্দর সোণার কাণ বানাইয়া দিয়াছেন। ফটো তুলিবার সময় সাজ সজ্জার জন্য গহনার বাক্স খোলা হইয়াছিল। খোকা ছাড়িল না, তাই তাহার হাতে একটা কাণ ছিল; সেই বেশেই তাহার ফটো তোলা হয়।"

অতুল। "তা খোকার ছবি বেশ উঠিয়াছে।—পাশে এ কার ছবি?

রমেশ। "কালেজে ভবভূতির উত্তরচরিত পড়িয়াছিলে না?"

অতুল। পড়িয়াছি বৈকি।"

রমেশ। প্রথম অঙ্কে চিত্র-পরিদর্শন সময় সীতা একটি স্ত্রীচিত্রের

দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'বাছা এটি কে ?'—লক্ষ্মণ কিন্তু সে কথার কোন উত্তর দেন নাই।"

অতুল। "আমি সীতা নই; কালেজে শিক্ষিত আজি কালির লক্ষ্মণ কিন্তু প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই উত্তর দিতে প্রস্তুত!—এ উর্ম্মিলা ঠাকুরাণীর দিব্য কাণ!"

নলিনীসুন্দরীর অবগুণ্ঠন আরও কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত হইল।

অতুল। "এ ছবি ঠিক হইয়াছে কি না, তা তুমি বলিতে পার।'

রমেশ। "আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলে বলিব ফটোগ্রাফার আদর্শের ভারি অপমান করিয়াছে।"

অতুল। "তা হবে।"

রমেশ। "তোমার বিশ্বাস না হয়, আদর্শ তো এখানেই উপস্থিত; তুলনা করিয়া দেখ।"

নলিনীসুন্দরীর অবগুণ্ঠন এবার অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত বৃদ্ধি পাইল।

অতুল। "তোমার কথায় আমার অবিশ্বাস নাই। দাদা, সোণার গিল্টি-করা ফ্রেমে বাঁধা এটা কি এ?"

রমেশচন্দ্র, খোকা ও নলিনীসুন্দরীর ছবির একটুকু উপরে দেয়ালে খাটান অতি সুন্দর বিলাতি ফ্রেমে বাঁধা একত্রে যোড়া দেওয়া দুই খানি মলিন কাগজ, তাহাতে দুই হাতের লেখা কতকগুলি অঙ্কপাত মাত্র। আমরা পাঠকবর্গের তৃপ্তির জন্য নিম্নে অঙ্কগুলি মুদ্রিত করিলাম :—

১৮।১২।১০—১৮ ১৩।১ —২৪৪।১১।৬—৩০।১২।১

১৫২।১১।৮—১০৪।১৪।৬—১৯৬।১।২—১৫১।৭।৫

২৪৯।১৬।৪—১২২।১০।১১—১৬৩। ৫।৩—৭৮। ৫।৫॥

২৪৪।১১।৬—২৪৪।১১।৭—১০৪।১৪।৬—৩৫।১৩।৪
৮৬।১৬।৬—৯৪। ১২।১—৮৬। ৪।২—২৪৫।২০।৭
৩৫।১৭।৭—৩৫।১১।৭—১৫৫। ১।১—২১৩।১৬।৯
৪১।১৮।৪—১১০।১৫।৩—১৫২। ২।৩—১৮৭।১৪।৪
৭।১৬।৬—৮।১২।৫—১৩৩। ৩।৪॥

অতি সুন্দর গিল্টি-করা ফ্রেমে সাজান প্রাচীন দৈবজ্ঞলিখিতবৎ, আশু অর্থযোগশূন্য শ্রেণীবদ্ধ অঙ্কপাত-সমন্বিত এই মলিন কাগজের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অতুল বলিলেন ;—"ইহার অর্থ কি ?"

বন্ধুদ্বয়ের দৃষ্টি যখন সেই অঙ্কশ্রেণীরদিকে প্রযুক্ত ছিল, সেই সময় নলিনীসুন্দরীর চকিত দৃষ্টিও একবার সেই দিকে নিপতিত হইয়াছিল ; কিন্তু সে কেবল মুহূর্ত্তমাত্রের জন্য। রমেশচন্দ্র যদি সেসময় অবগুণ্ঠন-বতীর দিকে চাহিতেন, তাহা হইলে জানালার অনতিদূরে উপবিষ্টা নলিনীসুন্দরীর সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়াও তাঁহার স্মিতবিভাসিত, আকর্ণ-আরক্ত মুখশ্রী দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র সেদিকে না চাহিয়াই উত্তর করিলেন ;—

"ঊর্ম্মিলা ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা কর।"

অতুল। "আমি তোমার মত নির্ম্মম নিষ্ঠুর নই ; অঙ্কশাস্ত্রে এম্. এ, তুমি কাছে থাকিতে এই দুর্ব্বোধ অঙ্কপাতের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়া আমি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিপন্ন করিব না।"

নলিনীসুন্দরী মনে মনে দেবরের শত প্রশংসা করিলেন।

রমেশ। "অর্থ না বুঝিয়া কি আর ইনি কাকচরিত্রের এক পৃষ্ঠাবৎ এই অঙ্কপাত গুলি নিজের শয্যাপার্শ্বে এত যত্ন করিয়া রাখিয়াছেন ?"

অতুল। "তা হউক ; তুমি বল।"

বুদ্ধিমান নাবিক যেমন ধনধান্যে ভরা নৌকা গঙ্গাস্রোতে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে দড়ি কাছি, দাঁড় বৈঠা পাল প্রভৃতি সরঞ্জাম সাজাইয়া

গুছাইয়া যথা স্থানে রাখিয়া প্রস্তুত হয়, পলায়নোন্মুখী নলিনীসুন্দরী তেমনি আপনার সাজ সজ্জা, সেমিজ সাড়ী, অবগুণ্ঠন আঁটিয়া টানিয়া ঠিক ঠাক করিতে লাগিলেন।

রমেশ। "আমাকেই বলিতে হইবে?—কিন্তু ইহার যে অংশ আমার লেখা, তাহার অর্থ আমি বলিব; আর যে গুলি অন্যের লেখা, তাহার অর্থ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।"

নলিনীসুন্দরী সজ্জিত পাণগুলি ডিবার মধ্যে রাখিয়া ডিবা বন্ধ করিলেন; বন্ধ করিবার সময় হাতের সোণার চুড়িগুলি ঝণৎকার করিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র চারু কর্ণবিলম্বী স্বর্ণ ইয়ারিং বিকম্পিত হইয়া আরক্ত গণ্ড আরও উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। স্মিতচক্ষে নলিনীসুন্দরীর দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া রমেশচন্দ্র আরম্ভ করিলেন;—

"সে আজ প্রায় চারি বৎসরের কথা। গঙ্গাতট-পরিশোভী সুন্দর মুঙ্গের সহর। চৈত্রমাসের শেষে একদিন সন্ধ্যার পর গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম, চন্দ্রোদয়ে চারিদিক জ্যোৎস্নাপ্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। মৃদুশীতলবাতাস—"

অতুল। "তুমি যে দস্তুর মত নভেল আরম্ভ করিলে!"

রমেশ। "আগে শুন।—মৃদু শীতল বাতাস ঝুরু ঝুরু করিয়া বহিতেছিল, গাছের ডালে কোকিল ডাকিতেছিল। আমি বেড়াইতে বেড়াইতে 'বসন্ত কুটীরের' দিকে—"

নলিনীসুন্দরী পাণ-ভরা ডিবাটী শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে সে ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অলক্তরাগরঞ্জিতপদ-সংসক্ত মলচতুষ্টয়ের রুণু ঝুণু শব্দে সেই গৃহ মৃদুমুখরিত হইয়া উঠিল।

রমেশ। "ওগো, পাণে চুণ কম হইয়াছে! ওগো—"

আর চুণ! নলিনীসুন্দরী সেঘর হইতে বাহির হইয়া পাশের ঘরে যাইয়া দরজা আঁটিয়া দিলেন।

পূর্ব্বকথা

রমেশচন্দ্র সেই অশ্রুপাতের কাহিনী অতুলচন্দ্রের নিকট বলিলেন। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য আমরা তাহা বিবৃত করিতেছি।

নলিনীসুন্দরীর পিতা হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বভাবকুলীন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার অবস্থা মন্দ ছিল না। পুত্র অক্ষয়চন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া কলিকাতার এক বড় হৌসে কাজ পাইয়াছেন। হারাণচন্দ্র মেলবন্ধ সমান ঘর হইতে প্রথমা পুত্রবধূ আনিয়াছিলেন; কিন্তু এক বৎসর না যাইতেই সে বধূর অভাব হয়। তাহার পর সিদ্ধ শ্রোত্রিয় মধুসূদন রায়ের কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনীর সহিত অক্ষয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন।

হারাণচন্দ্রের দ্বিতীয় সন্তান কন্যা নলিনীসুন্দরী। ঘরে শিক্ষিত বড় ভাই, তাহার সঙ্গে আবার উপযুক্ত ভ্রাতৃবধূ কুমুদিনীর মিলন হইল। বাল্যকাল হইতে ভ্রাতা, পরে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর যত্ন চেষ্টায় নলিনী সুশিক্ষিতা হইয়াছিল। নলিনীর বয়স পঞ্চদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল। স্বভাবকুলীনের কন্যা, মেলের ঘরে ভাল ছেলে নাই; সুতরাং এতক তাহার বিবাহ হয় নাই। সদ্যপ্রফুল্ল মধুগর্ভ অনাঘ্রাত কুসুম-কলিকার ন্যায় নলিনী পিতৃগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে রমেশচন্দ্র ভগিনী কুমুদিনীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সে বাড়ীতে যাইতে লাগিলেন। তখন রমেশচন্দ্র বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। মধুর বয়ঃসন্ধিকালে প্রথম দিন রমেশকে দেখিয়া নলিনী স্তম্ভিত হইল। বালিকা নিজের মনের ভাব কিছু বুঝিতে পারিল না। কোন কোন

দিন রমেশের মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া থাকিত। কোন কোন দিন অজ্ঞাতপ্রকৃতি লজ্জা, শঙ্কায় সঙ্কুচিত হইয়া পলাইয়া যাইত : কখনও বা শ্রদ্ধা, ভক্তি ; কখনও বা লজ্জা, মৃদুভীতি। উন্মেষোন্মুখী যুবতী পরে বুঝিতে পারিল—এ ভাব ভক্তি নহে, শ্রদ্ধা নহে ; অভক্তি অশ্রদ্ধা তো একেবারেই নহে। লজ্জা নহে ; ভীতি নহে ; আরও যেন কিছু, প্রগাঢ় চিত্তাকর্ষক আরও যেন কিছু !—কি ? যাহা কোন দিন দেখে নাই, যাহা কোন দিন আপন মনে অনুভব করে নাই,—হৃদয়ে সেই অননুভূতপূর্ব্ব তীব্রমধুর উদ্দীপক উন্মাদকারী এক নবীন উচ্ছ্বাস ! নলিনী শেষে বুঝিল, বুঝিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিল ;—

"প্রভু, দাসীকে রক্ষা কর। অকূল সমুদ্রে ভাসাইও না। অনিবার অগ্নিতে দগ্ধ করিও না ; আত্মসংবরণ শিক্ষা দাও।—আমি গরীব, রাজবৈভবে যেন আমার লোভ না হয় !"

বাসনা ও তৃপ্তির মধ্যে কত যে গিরিনদী ব্যবধান, নলিনী তাহা জানিত। পিতা সংসার লইয়া ব্যস্ত, মাতা যেন দেখিয়াও দেখেন না ; আত্মসুখে উন্মদচিত্ত ভ্রাতার চক্ষু তখনও বুঝি ফুটে নাই। কেবল এক জন বুঝিল ; বুঝিল সমবয়স্কা কুমুদিনী।

উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে, হাসিতে খেলিতে যে দিবা রাত্রি কাছে কাছে, সেই ভ্রাতৃবধূ বুঝিল। শূন্যনয়নে চন্দ্রালোকফুল্ল আকাশের দিকে তাহার চাহনি দেখিয়া বুঝিল ; অতর্কিত আহ্বানে তাহার চকিত দৃষ্টি দেখিয়া বুঝিল ; আহারে অনিচ্ছা, ভ্রমণে অনুদ্যম, অধ্যয়নে অমনোযোগ, হাসিতে বিষণ্ণতা, লাবণ্যে কালিমার ছায়া দেখিয়া বুঝিল। বুঝিয়া মস্তক অবনত করিয়া প্রার্থনা করিল ;—"প্রভু, এ কি করিলে ? দুইটী প্রাণীকে জীবন্তে দগ্ধ হইতে দেখিবে ?—

পর্ব্বত তো দুরারোহ, নদী তো দুস্তর! তবে কেন এ বিড়ম্বনা?"

একদিন কুমুদিনী নিভৃতে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"ঠাকুরঝির বিবাহের কি করিলে?"

অক্ষয়। "কিছুই হয় নাই।"

কুমু। "কবে হইবে?"

অক্ষয়। "বলা সহজ নহে। মেলের ঘরে দশ বৎসরের এক বালক আছে ; আর আছে দুইটা বৃদ্ধ!"

কুমুদিনী নিস্পন্দনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; পরে বলিলেন ;—

"এই ঘরেই করিতে হইবে?"

অক্ষয়। "মেল ভাঙ্গিয়া কাজ করা সহজ নহে।"

কুমু। "কেন?"

অক্ষয়। "কুল থাকিবে না।"

কুমু। "কুল দিয়া কি করিবে?"

অক্ষয়। "কি করিব, জানি না। তোমাকে এতদিন বড় কিছু বলি নাই ; তাই বলিয়া তুমি মনে করিও না যে, আমি নিশ্চিন্ত আছি। নলিনীর কথা মনে করিতে বুকে পাষাণের চাপ পড়ে। কাল মার সঙ্গে বিশেষ করিয়া আলাপ করিব।"

কুমু। "করিও, আর বিলম্ব করা চলে না।"

অক্ষয়। "কাল রমেশের এখানে আসার কথা আছে না?"

কুমু। "কথা ছিল ; কিন্তু দাদা লিখিয়াছেন, আসিতে পারিবেন না।"

অক্ষয়। "কেন? রমেশ কি রাগ করিয়াছে?—গত রবিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, আসে নাই ; কালও আসিবে না! কেন?"

কুমুদিনী তৎক্ষণাৎ কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। নিকটে

টেবিলের উপর বাটীতে দুধ ঢাকা ছিল; খোকার খাওয়ার সময় হইয়াছে। অগ্নিপাত্রে দুধ গরম করিতে দিয়া আসিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কুমুদিনী বলিলেন;—

"দাদা এখন আর এ বাড়ীতে বড় আসেন না। না আসাই ভাল।"

অক্ষয়। "সে কি!—রমেশের আসা ভাল না?"

কুমু। "তুমি অন্ধ! দূরদৃষ্টির জন্য চস্‌মা পরিয়াছ, কিন্তু তোমার দূরদৃষ্টি, নিকট দৃষ্টি কিছুই নাই!"

অক্ষয়। "রমেশ কি—"

কুমু। "শুধু তাহা হইলে দোষ ছিল না,—"

অক্ষয়। "আর কি?"

কুমু। "এ দিকে ঘরের কুসুমেও কীট ধরিয়াছে!"

অক্ষয়। "কুমু, আমি প্রকৃতই অন্ধ!"

তাহার পর দিন বিকালে কুমুদিনী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। নলিনী বারান্দায় খোকার হাত ধরিয়া "হাঁটি-হাঁটি" করিতেছিল। হাঁটিতে হাঁটিতে খোকা পড়িয়া যায়, আর উভয়ের মুখে হাসির উৎস ছুটে! আছাড় পড়িয়া খোকার হাসি, আর তাহাকে পড়িতে দেখিয়া হাতে তালি দিয়া নলিনীর হাসি!

অক্ষয়চন্দ্র আফিস হইতে আসিয়া মাতার ঘরে জলখাবার খাইতে খাইতে বলিলেন;—

"মা, নলিনীর সম্বন্ধের কি হইল?"

মাতা। "হবে আর কি? ঈশ্বর যা করেন, তাহাই হইবে।"

অক্ষয়। "মেলের ঘরে ছেলে নাই; অন্যত্র দেখিলে হয় না?"

মাতা। "আর কোথায় দেখিবি?"

অক্ষয়। "আচ্ছা, মা, রমেশের সঙ্গে হয় না?"

মাতা অনেক্ষণ পর্য্যন্ত পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শেষে গদ্গদকণ্ঠে বলিলেন ;—

"অমন ছেলে! কার্ত্তিকের মত রূপ, লেখা পড়ায় তোরাই তো বলিস্, কত কি পাশ করিয়াছে, ধনে জনে পূর্ণ ঘর। মানুষ তপস্যা করিয়া অমন ছেলে পায় না। কিন্তু———"

অক্ষয়। "কি, মা?"

মাতা। "জানিস্ই তো, রমেশ কুলীন নয়। কুল ছাড়িয়া কেমন করিয়া কাজ হইবে?"

অক্ষয়। "মা তোমরা তো দিন কাটাইয়া আসিলে; আমার জন্যই তো কুল?—তা আমি তোমাকে জানাইতেছি, ভঙ্গ হইলে আমার কোন কষ্ট হইবে না। গত বৎসর বাবা বলিয়াছিলেন যে, বর্দ্ধমানে--- গ্রামে আমাদের এক পাল্‌টা ঘর আছে; সে ঘরে এক পাত্র আছে। শুনিয়াছি, তাহার অবস্থা ভাল নয়, বয়সও বেশী হইয়াছে, ঘরে দুই স্ত্রী। বাবা বোধ হয় সেই চেষ্টায় আছেন?"

মাতা। "এক দিন আমার কাছেও তাহা বলিয়াছেন।—অভাগিনী কুলীনের ঘরে জন্মিয়াছে, ভাল কপাল কোথা হইতে আসিবে?"

অক্ষয়। "শুন, মা, সেখানে নলির বিবাহ হইতে পারিবে না। কুল যায়, যাইবে; নলি সুখে থাকিবে; রমেশের সঙ্গে কার্য্য করিতে হইবে। অমন সুন্দর ঘর, সুন্দর বর ফেলিয়া দিয়া কেন আমরা কোন্ বন জঙ্গলে ঝগড়া কন্দলের ঘরে, অপমূর্খের হাতে তাহাকে অর্পণ করিব?"

মাতা পুত্রে আরও অনেক কথা হইল। তাহার পর অক্ষয়চন্দ্র মাতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া নিজের শয়ন ঘরের দিকে গেলেন। বারান্দায় নলিনী ডাকিয়া বলিল ;—

"দাদা, দাঁড়াও, দাঁড়াও। দেখ, খোকা কেমন সুন্দর হাঁটিতে পারে।—হাঁট তো, খোকামণি! 'হাঁটি হাঁটি, পায় পায়'——"

দু চার পা চলিতেই শ্রীমান্ খোকা "পপাত ধরণীতলে!" অক্ষয়চন্দ্র বলিলেন;—

"হাঁ, নলি, খোকা বেশ হাঁটিতে পারে।"

অক্ষয়চন্দ্র দাঁড়াইলেন না। অন্যান্য দিন হাঁটিবার চেষ্টা করিয়া ধূলি বালু সমেত বাবার কোলে উঠিয়া খোকা মুখ চোখ ভরা কত পুরস্কার পায়, আজ আর তাহা পাইল না। নলিনী দেখিল দাদার মুখ যেন কেমন মলিন!

নলিনী তাহার পর খোকাকে লইয়া মাতার ঘরে গেল। মাতা বিষণ্ণ মুখে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতেছিলেন। নলিনী কাছে গেলে তাহার অবেণীবদ্ধ কেশরাশি দেখিয়া বলিলেন;—

"নলি, এখনো চুল বাঁধ নাই কেন?"

নলিনী। "বৌর অবসর ছিল না, এখন বাঁধিয়া দিবে।"

মাতা। "বেলা গেল, যাও, মা, চুল বাঁধ গিয়া; খোকা আমার কাছে থাকুক্।"

মাতার কণ্ঠস্বর যেন কেমন কাতর; দৃষ্টি যেন কেমন করুণ! নলিনী সেঘর হইতে বাহির হইয়া কুমুদিনীর ঘরের দিকে চলিল। দরজার কাছে যাইতেই শুনিল, কুমুদিনী বলিতেছেন;—

'——মেল ভঙ্গ সহজ নহে।"

উত্তরে অক্ষয়চন্দ্র বলিলেন;—

"মা স্বীকার হইয়াছেন; এখন রমেশ——"

শুনিয়া নলিনীর হৃদয়কক্ষে হঠাৎ যেন অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল, তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আর অগ্রসর হইল

না ; ধীরে ধীরে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সিঁড়ি দিয়া ছাদের উপর চলিয়া গেল। সূর্য্য অস্ত যাইবার অধিক বিলম্ব নাই। পশ্চিমাকাশে রবি-রাগরঞ্জিত মেঘমালা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে ; কাক, কপোত, চিল—কত পাখী আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে ; ঝাঁকে ঝাঁকে কত পাখী কুলায়-অন্বেষণে নানা দিকে ছুটিতেছে। নলিনী ছাদের আলিশা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া বিষণ্ণ নেত্রে আকাশের সেই মনোহর শোভার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নবযৌবনোদ্ভিন্ন গৌর মুখমণ্ডল সান্ধ্য রবিকরে স্ফুরদারক্তলাবণ্যময় হইয়া উঠিল।—চাহিয়া রহিল মাত্র, কিন্তু সে শোভা তাহার দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতে ছিল না। হৃদয়ে তাহার বিষম তরঙ্গাভিঘাত হইতেছিল।—হা ঈশ্বর!

এমন সময় আয়না চিরুণী লইয়া কুমুদিনী সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কি ভাবিতেছিস্, ঠাকুরঝি ?" অতর্কিত প্রশ্নে নলিনীর মুখ ফুল্লারবিন্দবৎ আকর্ণ রক্তাভ হইয়া উঠিল। কুমুদিনী বলিলেন ;—

"বেলা গেল, চুল বাঁধ্‌বি না ?"

কুমুদিনী তখন ক্ষিপ্রহস্তে শারদাকাশে সঞ্চরমান নবীন জলদজালবৎ নলিনীর নিবিড় কৃষ্ণ বিপুল কেশরাশি বেণীবদ্ধ করিয়া সুন্দর কবরী রচনা করিয়া দিলেন। কেশ রচনা শেষ করিয়া বস্ত্রাঞ্চলে তাহার মুখ পরিমার্জ্জিত করিয়া দিবার জন্য কুমুদিনী ননদকে ফিরাইয়া বসাইয়া দেখিলেন যে, তাহার সুন্দর আয়ত চক্ষু জলভরপরিনম্র হইয়াছে। নলিনী চক্ষু মুদ্রিত করিল, কিন্তু দুই বিন্দু অশ্রু তাহার সুদীর্ঘ নিবিড় পক্ষ্মশ্রেণী সংসক্ত হইয়া রহিল।

কুমু। "তুই কাঁদিতেছিস্, ভাই!"

নলিনী কোন উত্তর করিল না।

কুমু। "আমার কাছে গোপন করিতে পারিস্ নাই, আমি সকলই বুঝিয়াছি।—কেন এ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলি? কুলীনের কন্যা তুই, রায়বংশ যে শ্রোত্রিয়!"

দরবিগলিত অশ্রুধারা নলিনীর গণ্ড বক্ষ পদপ্রান্ত বিধৌত করিতে লাগিল। অতি ধীরে, অতি আদরে মৃদুহস্তে কুমুদিনী ননদের চক্ষু মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন ;—

"ঝাঁপ দিয়াছিস্, বোন্, দেখি আমরা কূল কিনারায় আনিতে পারি কি না।"

সন্ধ্যা বহিয়া যাইবার উপক্রম হইল। আকাশে চাঁদ উঠিল, কত গ্রহ নক্ষত্র উঠিল, শীতল সান্ধ্যবায়ু ঝুর্ ঝুর্ করিয়া বহিতে লাগিল। নলিনী কোন কথা বলিল না।

তখন মাতা ডাকিলেন। হাত ধরাধরি করিয়া ননদ আর ভ্রাতৃবধূ ছাদ হইতে নীচে নামিয়া গেলেন।

(৩)

আশার দাস

রমেশচন্দ্রের অবস্থা সম্পন্ন। কিন্তু বিধবা মাতা আর পারিয়া উঠেন না, শুধু ধনধান্য, বিত্তসম্পত্তি থাকিলেই সংসার হয় না। ঘরে দেখিবার, ভোগ করিবার কেহ নাই। কুমুদিনীর বিবাহ দিবার পর হইতে মাতা একাকিনী সংসার চালাইতেছেন; তিনি এখন বৃদ্ধা হইয়াছেন। পুত্র রমেশের বিবাহোচিত বয়স অনেক দিন হইয়াছে। কালেজের পাঠ শেষ না হইলে বিবাহ করিবেন না বলিয়া রমেশ এত দিন মাতাকে বুঝাইয়া রাখিয়াছেন। এখন সে আপত্তির কারণও নাই। এখন বিবাহে আর কি আপত্তি হইতে পারে? কিন্তু রমেশ আজ কাল করিয়া বড় বিলম্ব করিতেছেন। আজ মাতা রমেশকে বিশেষ করিয়া ধরিয়া বসিলেন।

মাতা। "আমাকে আর কত দিন আবদ্ধ রাখিবি? পড়া শুনা তো শেষ হইয়াছে, এখন বিবাহ কর্; খালি ঘরে আর তিষ্ঠিতে পারি না।"

রমেশ। "করিব বৈ কি, এ বৎসরটা যাক্।"

মাতা। "আজ কয় বৎসর তুই অই এক কথা বলিয়া আসিতেছিস্। আমার কি আর কোন সাধ নাই? বৌ আসিবে, ছেলেপিলের কোলাহলে আমার শূন্য গৃহ পূর্ণ হইবে—আমি বাঁচিয়া থাকিতে কি কিছুই হইবে না?"

রমেশ। "এই তো এই কয়েকটা মাস বৈ ত নয়?—যাই, একবার একটুক বাহিরে যাইতে হইবে।"

মাতা। "ঘটকীঠাকরুণকে আবার ভবানীপুর পাঠাইব?"

রমেশ। "না, মা। তোমাকে সেদিন বলিয়াছি, শীঘ্রই আমি একবার মুঙ্গের যাইব। আমি ফিরিয়া আসিলে যা হয় করিও।"

বিবাহের প্রস্তাব উঠিলেই রমেশ কথা কাটাইয়া চলিয়া যায়, মাতা তাহা জানিতেন।

বৈঠকখানায় আসিয়া একটা কাউচের উপর শুইয়া পড়িয়া রমেশচন্দ্র কত কি ভাবিতে লাগিলেন। মানুষ জানে যে, যে জিনিশের জন্য যত আগ্রহ, যত আকাঙ্ক্ষা—সে জিনিষ ততই দুর্লভ; তথাপি মানুষ চিরকাল আশার দাস! আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য বলিয়াই তো উপ-ভোগ এত মধুর, অতি তৃষ্ণাতেই তো জল এত সুরস! আকাঙ্ক্ষা বিড়ম্বনামাত্র হইতে পারে, কিন্তু এ মর্ত্ত্য ভূমিতে আকাঙ্ক্ষা দিয়াই তো মানুষের জীবন গঠিত, চিত্রিত, পরিচালিত। নলিনী নভঃসঞ্চারিণী সৌদামিনীবৎ দুষ্প্রাপ্য, দুঃস্পর্শ পারে; কিন্তু রমেশচন্দ্র যখন সেই দুষ্প্রাপ্যের আশায় একবার মন বাঁধিয়াছেন, তখন শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া সে বন্ধন আর শিথিল করিতে পারিতেছেন না।

এমন সময় হরকরা একখানা চিঠি দিয়া গেল। বৌবাজার হইতে আসিয়াছে, ভগিনা কুমুদিনীর লেখা ;—

"দাদা, আজ প্রায় পোনের দিন হইল তুমি আমাদিগকে দেখিতে এস নাই। আজ দশ বার দিন হইল খোকার অসুখ করিয়াছে, কিছুতেই সারিতেছে না। আমি ভারি চিন্তায় পড়িয়াছি। শ্রীযুক্তা শ্বশ্রূঠাকুরাণী আজ পাঁচ দিন হইল শয্যাগত, তাঁহারও জ্বর। এ দিকে আফিসের কামাই নাই; কাজ বড় বেশী পড়িয়াছে। আমি বড় কষ্টে আছি।

ঠাকুর বাড়ীতে নাই, বর্দ্ধমান গিয়াছেন। সেখানে নাকি মেলের ঘরে একটী পাত্র আছে। ঠাকুরঝির জন্য তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন।

এদিকে বাড়ীতে আর সকলের আর এক মত হইয়াছে। আজ দশ বার দিন হইল আফিস হইতে আসিয়া অনেক ক্ষণ মার সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলেন, মেল ছাড়িয়া ভাল বরের সঙ্গে বিবাহ দিতে বলেন। অনেক কথা হয়। ঠাকুরাণীর মত ফিরিয়াছে। এখন ঠাকুর বর্দ্ধমানে পাকা কথা না বলিয়া আসিলে হয়। ইহাঁরা তোমাকেই বোধ হয় ভাল বর মনে করিয়াছেন। মা আজ কয় বৎসর যাবৎ তোমার বিবাহের চেষ্টা করিতেছেন; এটা না, ওটা না, এখন না ইত্যাদি বলিয়া তুমি ফাঁকি দিতেছ। যদি এখানে হইবার কথা হয়, তবে তো স্বীকার আছ? কাল বিকালে অবশ্য আসিও। খোকার চিকিৎসার একটা ভাল ব্যবস্থা করিতে হইবে, তোমার সঙ্গে পরামর্শ না হইলে কিছু ঠিক করা যাইবে না। শুনিলাম, তুমি নাকি পশ্চিমে মুঙ্গের যাইবে? কেন?

সেবিকা—

কুমুদিনী।"

চিঠি পড়িয়া রমেশচন্দ্র উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া আবার পড়িলেন; কাউচ পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রকাণ্ড হলের এ পাশ ওপাশ বেড়াইতে বেড়াইতে আবার পড়িলেন। খোকার অসুখ করিয়াছে, বিশেষ চিন্তার বিষয়। কুমুর শাশুড়ীঠাকুরাণীর অসুখ করিয়াছে, সেও বড় বিপদ। কিন্তু তা ছাড়া চিঠিতে আরও কথা আছে। ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ আশার কথা;—মেল ভঙ্গ! তাহাই যদি হয়, তবে কি না হইতে পারে? বাস্তবিক রূপগুণ, বিদ্যাবুদ্ধি, বিত্তসম্পত্তিতে রমেশচন্দ্র যে প্রার্থনীয় বর, তাহা তিনি নিজে জানিতেন। কেবল কুলাংশে ন্যূন বলিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করাইতে সাহস করেন নাই। নতুবা তাঁহার কামনা পূরণ পক্ষে আর কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। কিন্তু সেই এক প্রতিবন্ধকই যে বিষম প্রতিবন্ধক; দুরপনেয়,

দুর্লঙ্ঘ্য ;—কুলীনকন্যায় শ্রোত্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা ! পরদিন বিকাল বেলায় রমেশচন্দ্র ভগিনীর বাড়ীতে গেলেন। ভাগিনেয়ের জ্বর তেমন প্রবল নহে, সামান্য জ্বর, কিন্তু তাহা ভাল করিয়া ছাড়ে না। তাহার শরীর বড় কৃশ হইয়া পড়িয়াছিল। সে “হাঁটি-হাঁটি” নাই, সে মধুর হাসির উৎস যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভগিনীপতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহার চিকিৎসার নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। কুমুর শাশুড়ীঠাকুরাণীর পুরাতন পীড়া। তিনি বয়সে নিতান্ত প্রাচীনা না হইলেও রোগ শোক চিন্তা দুঃখে তাঁহার শরীর অকালপক্ক, রুগ্ন হইয়াছে। দেশীয় ভাল কবিরাজ দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার কথা হইল। ভগিনীপতির সহিত আরও অনেক কথা হইল।

অক্ষয়। “আমি একা পড়িয়াছি, বাবা বাড়ীতে নাই ; আফিসেও ছুটি নাই।”

রমেশ। “তিনি——”

অক্ষয়। “বৰ্দ্ধমান গিয়াছেন। নলিনীর বিবাহ এখন না দিলেই নয়। আমরা কুলীন বলিয়া এতদিন সহিয়াছে, কিন্তু আর গৌণ করা উচিত নয়।—কেমন, তুমি কি মনে কর ?”

রমেশ। “এখন তো হওয়াই উচিত।”

অক্ষয়। “আমাদের নানা বিপদ। মেল-বাঁধা ঘর, ভাল বর পাওয়া বড় কঠিন। এক ঘরে দশ বৎসরের এক ছেলে আছে, আর আছে দুইটী বৃদ্ধ !”

রমেশ কোন উত্তর করিলেন না, চাহিয়া রহিলেন।

অক্ষয়। “বৰ্দ্ধমানে না কি আর একটী পাত্র আছে ; বয়স চল্লিশ হইবে ; তাঁহার দুই বিবাহ, দুই স্ত্রীই বর্ত্তমান। আমাদের পাল্টা আর ঘর নাই। বাবা এই পাত্রের অনুসন্ধানে গিয়াছেন।”

রমেশ। "কবে ফিরিবেন?"

অক্ষয়। "এ পাত্রের সঙ্গে কার্য্য করিবার ইচ্ছা আমার একেবারেই নাই; মা-ও সম্পূর্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। মেল ছাড়িয়া দিয়া সুপাত্রে নলিনীর সম্বন্ধ ঠিক করিবার চেষ্টা করিব।"

রমেশ। "তোমার পিতা ঠাকুর সম্মত হইবেন?"

অক্ষয়। "তাঁহাকে সম্মত করাইতে হইবে। সহজে যে সম্মত হইবেন, সে ভরসা কম। তবে আমরা বিশেষ চেষ্টা করিব, শ্রোত্রিয়ের মধ্যে সৎপাত্র পাওয়া যাইতে পারে।"

রমেশ। "মেল ছাড়িয়া ভগিনীর বিবাহ দিলে অনেক ভাল বর পাওয়া যাইবে।"

অক্ষয়। "শোন,——থাক্। তুমি কি শীঘ্রই মুঙ্গের যাইবে?"

রমেশ। "আগামী শনিবার যাইব মনে করিয়াছি।"

অক্ষয়। "এখন কেন যাইবে? তোমার সঙ্গে বিশেষ পরামর্শ আবশ্যক হইতে পারে।"

রমেশ। "আবশ্যক হয়, আমাকে চিঠি লিখিও, আসিব।"

অক্ষয়চন্দ্র আর অগ্রসর হইলেন না। বাড়ীর কর্ত্তা তিনি নহেন, ভবিষ্যতের স্থিরতা নাই; আত্মীয়ের সঙ্গে কথা, অধিক কিছু বলা শ্রেয় জ্ঞান করিলেন না। কিন্তু উভয়ে উভয়ের মনোগত ভাব বুঝিলেন।

বাড়ীর ভিতরে কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"মুঙ্গের কি নিশ্চয় যাইবে, দাদা?—কেন যাইতেছ?"

রমেশ। "মনটা ভাল লাগিতেছে না; কয়েকটা দিন বেড়াইয়া আসিব।"

কুমু। "কোন কথা বার্ত্তা হইল?"

রমেশ। "তোমার শ্বশুরঠাকুর ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত আমার কলিকাতায় থাকা যেন অক্ষয়ের ইচ্ছা।"

কুমুদিনী দাদার মুখের দিকে কিছু কাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন ;—

"তবে যাইতেছ কেন? থাকিয়া যাও না কেন?"

রমেশ। "না, যাইব। খোকা কেমন থাকে, আমার কাছে লিখিস্।"

তার পর শনিবার দিন রমেশচন্দ্র মুঙ্গের যাত্রা করিলেন। সময় কাটাইবার জন্য সঙ্গে কতকগুলি ইংরেজি পুস্তক আর বঙ্কিম বাবুর অনেকগুলি উপন্যাস সঙ্গে হইলেন।

ইতস্ততঃ

পাত্র দেখিয়া চট্টোপাধ্যায়মহাশয় বড়ই ইতস্ততের মধ্যে পড়িলেন। পাত্রের বয়স চল্লিশের উপর হইবে না, কিন্তু দুই বিবাহ, অনেক গুলি সন্তানসন্ততি। অবস্থা ভাল নয়। সামান্য কিছু জোত জমির উপর নির্ভর। কয়েকখানা জীর্ণ খড়ের ঘর, আর গরু, গোশালা, গোময় ও বিচালির স্তূপ। চট্টোপাধ্যায়মহাশয়ের চিরকাল বাস কলিকাতায়; নিজে চাকরী বাকরী করিয়া সংসার চালাইয়াছেন, এখন তো যোগ্য পুত্রের উপার্জ্জনে অবস্থা একরূপ স্বচ্ছলই হইয়াছে। পুত্রের ইচ্ছানুসারে কন্যা নলিনীকে বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া তিন চারি বৎসর লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। পরে নলিনী বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃবধূ কুমুদিনীর সঙ্গে একত্রে বাড়ীতেই পড়াশুনা করিয়া বেশ সুশিক্ষিতা হইয়াছিল। কন্যাকে এতদিন লালন পালন ও সুশিক্ষিতা করিয়া এখন এই দূর পল্লীগ্রামে যুগ্মসপত্নীশাসিত অস্বচ্ছল ঘরে তাহার বিবাহ দিতে হয় দেখিয়া চট্টোপাধ্যায়মহাশয় বড় মানসিক কষ্টে পড়িলেন। তাঁহার চিত্ত নির্ম্মম ছিল না; কিন্তু পুরুষপরম্পরাগত কুলমর্য্যাদা সহসা পরিত্যাগ করাও সহজ নহে। বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া আসিলে গৃহিণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কেমন দেখিয়া আসিলে?"

কর্ত্তা। "অবস্থা এক রকম মন্দ নয়। ঘরদুয়ার, ক্ষেতখামার আছে, গরুবাছুর আছে, এক প্রকার চলে।"

গৃহিণী। "কয় বিবাহ?"

কর্ত্তা। "দুইটী; দুই স্ত্রীই ঘরে।"

গৃহিণী। "কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া আসিয়াছ ?"

কর্ত্তা। "একেবারে ঠিক করি নাই ; দাবী বেশি।"

গৃহিণী। "সে কি ?"

কর্ত্তা। "পাঁচ শত টাকা নগদ দিতে হইবে।"

গৃহিণী। "মেলের ঘরে টাকা কেন ?"

কর্ত্তা। "মেলের ঘর বটে, কিন্তু ঠেকা আমাদের, মেয়ে আমাদের।"

গৃহিণী। "অক্ষয় কোন মতেই এখানে কার্য্য করিবে না। সতীনের ঘর, বুড়ো মূর্খ বর——"

কর্ত্তা। "আর যে ঘর নাই। আর বর কোথায় পাইব ?"

গৃহিণী। "মেল ছাড়।"

কর্ত্তা। "তুমি পাগল হইয়াছ ?"

তাহার পর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রের সঙ্গে আলাপ করিলেন। অক্ষয়চন্দ্র এ কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিমত প্রকাশ করিলেন। পিতা অনেক যুক্তি দেখাইলেন, পুত্র স্বীকার হইলেন না।

পিতা। "তবে আর কোথায় করিবে ? আর ঘর নাই।"

পুত্র। "ঘর নাই, মেল ছাড়িয়া করিব। ঘর নাই বলিয়া কি নলিনীকে জলে ভাসাইব ?—রমেশের সঙ্গে করি না কেন ? অমন বর কি পাইব ? স্বভাবচরিত্র, বিদ্যাবুদ্ধি, ধনসম্পত্তি, সকল বিষয়েই তো শ্রেষ্ঠ।"

পুত্রের মত পিতা পূর্ব্বেই গৃহিণীর নিকট শুনিয়াছিলেন, অমন জামাতা কে না আকাঙ্ক্ষা করে ? কিন্তু—সে যে শ্রোত্রিয় !

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছুই অবধারিত করিতে পারিলেন না। দিন যাইতে লাগিল। এ দিকে খোকার শরীর ক্রমেই খারাপ হইতে চলিল। অল্প অল্প জ্বর, যকৃতের দোষ। গৃহিণীও দিন দিন অধিক কাতর হইয়া পড়িলেন।

রমেশচন্দ্র মুঙ্গেরে ভগিনীর চিঠি পাইলেন ;—

"ঠাকুর ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিছুই ঠিক হয় নাই। এখানে কেবল আলোচনা চলিতেছে। ঠাকুরের এক মত, আর সকলের আর এক মত। খোকার অসুখ কমিতেছে না ; দিন দিন রোগা হইতেছে। ঠাকুরাণী তো অচল প্রায়।"

কয়েক দিন পরে অক্ষয়চন্দ্রের চিঠি আসিল ;—

"গঙ্গার ধারে ভাল দেখিয়া একখানা বাড়ী ঠিক করিবে। মা এবং খোকা দুইয়েরই অবস্থা খুব খারাপ। এখানে চিকিৎসায় কোন উপকার হইতেছে না। চিকিৎসকগণ ইঁহাদিগকে পশ্চিমে মুঙ্গের লইয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছেন। সেখানকার জলবায়ুতে উপকারের বিশেষ সম্ভাবনা। তুমি সেখানে আছ, বড় ভাল হইয়াছে। একটা বাড়ী ঠিক করিয়া শীঘ্র চিঠি লিখিবে ; তোমার চিঠি পাইলেই আমি সকলকে লইয়া যাত্রা করিব।"

মুঙ্গেরের প্রাচীন দুর্গ মধ্যে গঙ্গাতীরে একটী অতি সুন্দর বাড়ী রমেশচন্দ্র স্থির করিয়াছিলেন। সে বাড়ীর নাম "বসন্ত কুটীর।" কয়েক দিন পরে চট্টোপাধ্যায়মহাশয় পুত্র কন্যা পুত্রবধূ পৌত্র চাকর চাকরাণী লইয়া সেই বাড়ীতে আসিলেন।

বিবৃতি

এক দিন সন্ধ্যার সময় রমেশচন্দ্র নিজের বাড়ী হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে ভগিনীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। গঙ্গাশীকরস্পর্শশীতল, করবীকুসুমসুবাসিত মৃদুবায়ু ঝুর্ ঝুর্ করিয়া বহিতেছিল। বাটীর তিন দিক বেষ্টন করিয়া প্রসন্নসলিলা গঙ্গা প্রবাহিত। মন্দ প্রদোষবাতোত্থিত, জ্যোৎস্নাপ্রফুল্ল বীচিমালা বাটীর প্রান্তবর্ত্তী প্রস্তর প্রাচীরমূলে প্রতিহত হইতেছিল।

এই সুন্দর সুখময় সময়ে রমেশচন্দ্র একবারে ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বাটী সংলগ্ন ফুলের বাগানে প্রবেশ করিলেন। গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গে চন্দ্রবিম্ব শতধা চূর্ণ হইতেছিল। বাগানে নানাজাতি ফুল ফুটিয়াছিল। কোথায় কোন্ নিভৃত দেশে বসিয়া যেন একটা কোকিল ডাকিয়া ডাকিয়া দিগন্ত আকুল করিতেছিল। দেখিয়া শুনিয়া রমেশচন্দ্রের চিত্ত ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

নিকটে একখান বেঞ্চ ছিল, রমেশচন্দ্র তাহার উপর বসিলেন। বেঞ্চের উপরে একখান পুস্তক পড়িয়া ছিল, তুলিয়া লইয়া দেখিলেন সেখানি বঙ্কিমচন্দ্রের "মৃণালিনী"। তাঁহার কৌতূহলের উদ্রেক হইল; পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে পাঠকের সহানুভূতিসূচক রেখা চিহ্ন, স্থানে স্থানে রমণীহস্ত লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্য! পুস্তকে যেখানে মনোরমা হেমচন্দ্রকে বলিতেছেন,—"ভাই, গঙ্গাতীরে গিয়া দাঁড়াও, গঙ্গাকে ডাকিয়া কহ, গঙ্গা, তুমি পর্ব্বতে ফিরিয়া যাও।" তাহার পার্শ্বে স্পষ্ট রেখাচিহ্ন। তাহার পর যেখানে হেমচন্দ্র বলিতেছেন,—"'বিস্মৃত

হও', এই উপদেশের অপেক্ষা হাস্যাস্পদ আর কিছুই নাই। কেহ কাহাকে বলে না, অর্থ চিন্তা ছাড়, যশের ইচ্ছা ছাড়, * * * তবে কেন বলিবে, ভালবাসা ছাড়? ভালবাসা কি এ সকল অপেক্ষা ছোট?" তাহার পাশে অতিস্পষ্টাক্ষরে লেখা—"অতি যথার্থ!" সেখানে মৃণালিনী গিরিজায়াকে বলিতেছেন,—"ভাল বাসিতাম কি? তুমি ভাল বাস; নহিলে কাঁদিলে কেন?" সেখানে পার্শ্বে সেই হস্তাক্ষরে লেখা—"ঠিক!" "আমি ভাবিতেছি, মনোরমাই ভাগ্যবতী। আমি হেমচন্দ্রের সেবা করিতে পারিলাম না, সে করিল।"—মৃণালিনীর এই উক্তির পার্শ্বে সহৃদয় সম্মতিসূচক বৃহৎ দাঁড়ি চিহ্ন! আরও স্থানে স্থানে মর্ম্মগ্রহ বোধক চিহ্ন, হস্তাক্ষর! রমেশচন্দ্র পুস্তকের প্রথমে মলাটের পরপৃষ্ঠায় দেখিলেন গ্রন্থস্বামিনীর নাম লেখা রহিয়াছে—"শ্রীনলিনীসুন্দরী দেবী।" জানি না, তখন কেন যে রমেশচন্দ্রের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। স্ফুট চন্দ্রালোকে রমেশচন্দ্র আরও দেখিলেন, গ্রন্থস্বামিনীর নামের নীচে কি যেন কতকগুলি অঙ্কপাত রহিয়াছে,—১৮।২।১০—১৮।১৩।১ ইত্যাদি। কিছুই মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলেন না। রাত্রি হইতে চলিল। রমেশচন্দ্র পুস্তকখানি জামার পকেটে লইলেন।

সেদিন রমেশচন্দ্র ভগিনীর বাটীতে অধিক গৌণ করিলেন না। নিজের বাসায় আসিয়া পকেট হইতে পুস্তকখানি বাহির করিয়া যেখানে কোন মন্তব্য, যেখানে কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন, সেই সকল স্থান পড়িতে লাগিলেন। যিনি এ সকল মন্তব্য লিখিয়াছেন, স্থানে স্থানে চিহ্ন প্রয়োগ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই সেই সকল স্থানের মর্ম্ম বিশেষ করিয়া বুঝিয়াছেন; মন্তব্য ও চিহ্নগুলি তো মর্ম্মগ্রহণকুশল হৃদয়শালীতার পরিচয়! ভগিনী কুমুদিনীর হস্তাক্ষর রমেশচন্দ্র চিনিতেন, এ সে

হস্তাক্ষর নহে। গ্রন্থাধিকারিণীই গন্তব্যলেখিকা! হা ঈশ্বর! দুরধিগম্য তড়াগবক্ষে কমল বিকসিত হয়, হউক; কিন্তু সৌরভ শোভা বিস্তার করিয়া স্বচ্ছন্দ-দূরতটবিহারী পথিকের চিত্ত কেন আকুলিত করে? রমেশচন্দ্রের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

আর, এ অঙ্কপাতগুলি কি?—

১৮।১২।১০—১৮।১৩।১—২৪৪।১১।৬—৩০।১২।১

১৫২।১১।৮—১০৮।১৪।৬—১৯৪।১।২—১৫১।৭।৫

২৪৯।১৬।৪—১২২।১০।১১—১৬৩।৫।৩—৭৮।৫।৫॥

রমেশচন্দ্র অনেক চিন্তা করিলেন, অনেক অনুধাবন করিলেন। বার তিথি নক্ষত্র?—না! তারিখ মাস বৎসর?—না! দণ্ড পল বিপল?—না! তবে এগুলি কি? অকস্মাৎ তাঁহার মুখ হর্ষবিকশিত হইয়া উঠিল। ১৮।১২।১০! মৃণালিনীর অষ্টাদশ পৃষ্ঠা খুলিলেন, দ্বাদশ পংক্তির দশম শব্দ "এ", ত্রয়োদশ পংক্তির প্রথম শব্দ—"সংসারে";—"এ সংসারে"!—তাহার পর ২৪৪ পৃষ্ঠার একাদশ পংক্তির ষষ্ঠ শব্দ "কামনা", ৩০ পৃষ্ঠার দ্বাদশ পংক্তির প্রথম শব্দ—"সামগ্রী";

"এ সংসারে কামনার সামগ্রী"—!

রমেশচন্দ্র তখন তাড়াতাড়ি অঙ্ক ভেদ করিয়া একখানি কাগজে লিখিতে লাগিলেন; শেষে পড়িয়া দেখিলেন, অঙ্কপাতের অর্থ—

"এ সংসারে কামনার সামগ্রী
বড়ই দুর্লভ; তাহা না
হইলে পৃথিবী স্বর্গ হইত।"

পাঠ করিয়া রমেশচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। নলিনীসুন্দরী লিখিয়াছেন! কামনার সামগ্রী! নলিনীসুন্দরী তো বালিকা নহেন। তবে কি—?

হরি! হরি! মানুষের দুয়ারের পাশে, ঘরের কোণে, হাতের কাছে কামনার বস্তু বিরাজ করে; তথাপি তাহা কত দুঃস্পর্শ, কত দুর্লভ!—স্বর্গ?—স্বর্গ কি গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্রলোকের অপর পারে?—যাঁহার পুণ্যবল আছে, তাঁহার শয়নকক্ষই তো অমরার স্বর্ণকক্ষবিজয়ী পরম রমণীয় সুখাগার! কিন্তু সে সুকৃতিসঞ্চয় কয় জনের আছে?

সে রাত্রিতে রমেশচন্দ্রের নিদ্রা অতি কম হইয়াছিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়া শুনা কল্পনায় কাটিয়া গেল। কখনও বা কামচারিণী কল্পনার পক্ষাশ্রয় করিয়া সুরঙ্গিন ইন্দ্রচাপরঞ্জিত নীলাকাশতলে সুরজনকাঙ্ক্ষিত নন্দন কাননের সুবাসিত কুঞ্জে কুঞ্জে বিচরণ করিতে লাগিলেন, কখনও বা গুরুপ্রস্তরভারগ্রস্ত অতল জলে নিমজ্জমান হতভাগ্যের ন্যায় অবসন্ন, মথিতচিত্ত হইতে লাগিলেন। প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রমেশচন্দ্রের নিদ্রা আসিয়াছিল।

খোকার অবস্থা এখন অনেক ভাল। তাহার হাসিখুসি এখন ফিরিয়া আসিয়াছে; খোকা পুনরায় হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু মাতার স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হইতেছিল। বায়ু পরিবর্ত্তনে তাঁহার কোন উপকার হয় নাই, বরং অপকার হইয়াছে।

এক দিন মাতার শরীর যেন কিছু ভাল বোধ হইল। দুপ্রহরে তাঁহার সুনিদ্রা হইল। নলিনী কুমুদিনীর শয়ন ঘরে খোকাকে খেলা দিতেছিল। এমন সময় কুমুদিনী একখানা চিঠি আর একখানা পুস্তক হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন;—

"ঠাকুরঝি, কা'ল হইতে না তুই তোর 'মৃণালিনী' খুঁজিয়া পাইতেছিস্ না?—এই নে তোর 'মৃণালিনী'; আর ন্যাখ্ চিঠি পড়িয়া, কোথাকার বই কোথায় গিয়াছিল।"

চিঠিতে লেখা ছিল;—"কাল তোমাদের ফুল বাগানে বেঞ্চের উপর

এক খানা বই পাইয়াছিলাম; এই লোকের সঙ্গে তাহা ফেরত পাঠাই-তেছি।—তোমার দাদা।”

চিঠি পাঠ করিয়া নলিনী কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া বলিল;—

“বোধ হয় সন্ধ্যার সময় বাগানে বেঞ্চের উপর ফেলিয়া আসিয়া-ছিলাম!”

—কিন্তু পুস্তক খুলিয়াই বলিল;—

“এ বই তো আমার নয়! এ যে—”

প্রথমেই নলিনী দেখিল, পুস্তকে “শ্রীরমেশচন্দ্র রায়” নাম লেখা রহিয়াছে, কিন্তু তৎক্ষণাৎই দেখিতে পাইল, নামের নিম্ন ভাগেই কতক-গুলি অঙ্ক লেখা রহিয়াছে;—

২৪৪।১১।৬—২৪৪।১১।৭—১০৪।১৪।৬—৩৫।১৪।৪

৮৪।১৬।৬—৯৪।১১।১—৮৬। ৪।২—২৪৫।২০।৭

৩৫।১৭।৭—৩৫।১১।৭—১৫৫।১।১ —২১৩।১৬।৯

৪১।১৮।৪—১১০।১৫।৩—১২৫।২।৩—১৮৭।১৪।৪

৭।১৬।৬— ৮।১২।৫—১৩৩। ৩।৪ ॥

নলিনীর সাগ্রহ দৃষ্টি সেই গুলির প্রতি ন্যস্ত ছিল।

কুমু। “কি লো?—কার বই?”

নলিনী। “নাম পড়িয়া ছাখ্।”

কুমু। “তাই তো, দাদা দেখি দিব্য ভুল করিয়াছেন!—নামের নীচে ধারাপাতের নামতা, কাঠাকিয়ার মত এ আঁক গুলি কি?”

নলিনী দেখিয়াই সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়াছিল; অর্থোদ্ধার করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু ভবিষ্যত ভাবিয়া তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহার নিজের পুস্তকে লিখিত কথা গুলির সঙ্গে কি এ গুলির কোন সম্বন্ধ আছে? সে গুলি তো রমেশচন্দ্র দেখিয়াছেন!

কুমু। "আঁক গুলির অর্থ কি কিছু বুঝিলি ?"

নলিনী। "যখন স্কুলে যাইতাম, আমাদের ক্লাসের একটী মেয়ে এই রকম একটি সঙ্কেত আমাদিগকে শিখাইয়াছিল! এ বোধ হয় সেই সঙ্কেতই হইবে।"

তখন নলিনীসুন্দরী অর্থোদ্ধার করিয়া থরকম্পিত হস্তে এক খানা কাগজে পেন্সিল দিয়া লিখিল ;—

কামনার	বিষয়	দুর্লভ	হইতে
পারে	কিন্তু	মানুষ	শেষ
পর্য্যন্ত	আশা	ত্যাগ	করে
না	আশা	অবলম্বন	করিয়া
জীবন	ধারণ	করে ॥	

পাঠ করিয়া নলিনীর বুক দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কুমুদিনীও কিছু চিন্তাকুল হইল।—দাদা এই সাঙ্কেতিক লেখাযুক্ত বই কি ইচ্ছা করিয়া, না ভুল করিয়া পাঠাইয়াছেন ? ইচ্ছা করিয়া, ঠাকুরঝি পড়িবে বলিয়া যদি পাঠাইয়া থাকেন,—না, দাদা তেমন লোক নহেন। একটা মস্ত ভুল হইয়াছে। কিন্তু কাজ ভাল হয় নাই। প্রকাশ্যে বলিলেন ;—

"রাখিয়া দে, ঠাকুরঝি, বই খানা ; চাকরটী চলিয়া গিয়াছে, বিকালে দাদা আসিলে ফিরাইয়া দিব।—আমি যাই, ঠাকুরাণী ডাকিতেছেন।"

খোকা দুলিতে দুলিতে মায়ের কোলে গেল। নলিনী একাকিনী সেই ঘরে বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল।

এমন সময় চাকরাণী আর এক খানা চিঠি ও বই লইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ;—

"দিদিবাবু, বৌঠাক্‌রুণ্‌ কোথায় ?"

নলিনী। "দে, আমার কাছে দে।"

পুস্তক ও চিঠি খানি রাখিয়া চাকরাণী চলিয়া গেল। নলিনী দেখিল এখানা তাহারই 'মৃণালিনী'। তখন চকিতনেত্রে দরজার দিকে চাহিয়া নলিনী দ্রুত হস্তে নিজের নাম ও সেই অঙ্কপাতযুক্ত পাতাখানি আমূল ছিন্ন করিয়া লুকাইয়া রাখিল। আজ দুই তিন দিন হইল কেন যেন সেই কিশোর কালের শিক্ষিত সঙ্কেত স্মরণ করিয়া নলিনী কয়েকটা কথা পুস্তকের সেই পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিল। সে পুস্তক যে বাহিরে কাহারও হাতে পড়িবে, এ সন্দেহ তাহার মনে উদয় হয় নাই। কুমুদিনীও এপর্য্যন্ত তাহা দেখেন নাই। নলিনীর বড় ভয় হইল, যদি কুমুদিনী এখন তাহা দেখিয়া তাঁহার দাদার পুস্তকে লিখিত কথা গুলির সঙ্গে তুলনা করেন, তবে কি মনে করিবেন? ভয়ত্রস্তহস্তে নলিনী সেই পাতাখানি ছিঁড়িয়া লুকাইয়া রাখিয়া কুমুদিনীকে ডাকিল।

নলিনী। "এই নে, তোর চিঠি নে। আমার বই আমি পাইয়াছি। ভুল সংশোধন জন্য আবার লোক আসিয়াছে!"

চিঠিতে লেখা ছিল;—"বামণ ঠাকুর বৃহৎ ভুল করিয়াছে। তোমাদের পুস্তকের পরিবর্ত্তে আমার নিজের খানা পাঠাইয়াছে। তোমাদের 'মৃণালিনী' পাঠাইতেছি। আমার খানা এই লোকের সঙ্গে শীঘ্র ফেরত পাঠাইবে।"

বামণ ঠাকুরকে ডাকাইয়া কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, রমেশচন্দ্র সে দিন আহারান্তে বাহিরে চলিয়া যাইবার সময় ব্রাহ্মণের হাতে সে চিঠিখানা দিয়া এবং নলিনীসুন্দরীর "মৃণালিনী" খানা দেখাইয়া দিয়া এ বাড়ীতে শীঘ্র পাঠাইবার জন্য বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বাড়ীর চাকর টেবল পরিষ্কার করিবার সময় কাগজ পত্র পুস্তকাদি যাহা যাহা তাহার উপর ছিল তৎসমস্তের শৃঙ্খলা করিয়া

ছিল। পরে আহারান্তে বামণ ঠাকুর যখন চিঠি সহ চাকরকে পাঠায়, তখন ভুল ক্রমে রমেশ চন্দ্রের নিজের পুস্তক খানা তাহার হাতে দেয়। ঠাকুর বাঙ্গালা লেখা পড়া কিছু জানিত।

কুমুদিনী দেখিলেন, ভুলই হইয়াছিল; কিন্তু বড় মারাত্মক ভুল। দাদার এই ভ্রম ঠাকুরঝিকে অগাধ জলে না ডুবায়!

রাত্রিতে কুমুদিনী স্বামীকে বলিলেন;—"ঠাকুরঝি সম্বন্ধে একটা কিছু শীঘ্র ঠিক করিতে হয়।"

অক্ষয়চন্দ্র বলিলেন;—

"মা'র অসুখটা আরাম হইলেই সব ঠিক ঠাক করিব। আমি তো মনে মনে ঠিকই করিয়াছি: মাকেও বলিয়াছি।"

---

(৬)

গ্রন্থিবন্ধন

কিন্তু মাতার অসুখ আর সারিল না। ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া শেষে অতি আশঙ্কাজনক অবস্থায় পৌঁছিল। দিনরাত্রি জাগিয়া কন্যা, পুত্রবধূ তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন; দিন রাত্রি জাগিয়া অক্ষয়চন্দ্র, রমেশচন্দ্র তাঁহার তত্ত্বাবধান, তাঁহাকে ঔষধ সেবন করাইলেন। সেবাশুশ্রূষা, যত্নচেষ্টা চিকিৎসা যতদূর সম্ভব তাহা হইল, কিন্তু তাঁহার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে হইতে লাগিল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গৃহিণীকে কলিকাতা লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু গৃহিণী তাহাতে স্বীকার হইলেন না। রুগ্নশয্যায় শয়ন করিয়া পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর মনোহর তরঙ্গলীলা দেখিতে পান; জ্যোৎস্নাপ্রফুল্ল যামিনীতে গঙ্গার শীতল মৃদু বাতাসে তাঁহার গাত্রজ্বালা প্রশমিত হয়;—এমন পবিত্র নীরিবিলী স্থান পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতার ক্ষুদ্র গলি মধ্যে ক্ষুদ্র বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে গৃহিণীর একান্ত অনিচ্ছা। দিনই যদি আসিয়া থাকে, তবে—ঈশ্বর করুন্—গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি শুনিতে শুনিতে, সুরতরঙ্গিণীর তরঙ্গভঙ্গ দেখিতে দেখিতে, পুত্র পৌত্রের সাক্ষাতে স্বামীর চরণপ্রান্তে মস্তক রাখিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। শুনিয়া স্বামী পুত্র কন্যা পুত্রবধূ কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তাঁহাকে কলি-কাতায় লইয়া যাওয়া হইল না। সেই খানেই চিকিৎসা চলিতে লাগিল; কিন্তু আর ভরসা রহিল না।

রমেশচন্দ্র এখন দিন রাত্রির প্রায় অধিকাংশ সময় সে বাড়ীতে, পুত্রের ন্যায় গৃহিণীর কাছে কাছে। সময় সময় অক্ষয়চন্দ্র ভারী বিপদ

আশঙ্কায় নিতান্ত ম্রিয়মাণ অবসন্ন হইয়া পড়িতেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র অকাতরে নিরন্তর খাটিতেন। বিদেশে বিপাকে আত্মীয়তা আরও গাঢ় হয়।

মাতা দেখিতেন; রমেশচন্দ্রের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, তাহার হৃদয়-ভরা মায়া, তাহার অকপট ব্যবহার, তাহার দেবদুর্লভ চরিত্র মাতা দিবা-রাত্রি লক্ষ্য করিতেন। আর দেখিতেন নলিনী ও রমেশের ভাব। কেহ কাহারও দিকে মুখ তুলিয়া চাহিত না। কিন্তু সেবাশুশ্রূষা, পথ্য ঔষধ প্রদান ইত্যাদি কার্য্যে যখন যাহার যতটুকু সাহায্য করা আবশ্যক, অপরে তখনই নিঃশব্দে তাহা করিয়া দেয়; এক জন গৃহে প্রবেশ করিলে অন্য জন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যায় না,—কেনই বা যাইবে? রোগশয্যাপার্শ্বে লজ্জার তীব্রতা কমিয়া যায়!—কিন্তু কেমন যেন মৃদু সঙ্কোচে আরব্ধ কার্য্যে আরও মনসংযোগ করে। মাতা দেখিতেন, আর কত কি ভাবিতেন;—প্রজাপতি কি মুখ তুলিয়া চাহিবেন?

এক দিন দুপ্রহরে গৃহিণীর অবস্থা বড়ই খারাপ হইল। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাশের ঘরে একটুকু আরাম করিতে ছিলেন। গৃহিণীর নিকট নলিনী, কুমুদিনী, অক্ষয়চন্দ্র আর রমেশ। খোকা এখন অনেক সময়ই চাকরাণীর কোলে। গৃহিণীর অবস্থা বড়ই খারাপ; তাঁহার যেন বাক্য রোধ হইয়া আসিতেছে। সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা, চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে। পদসম্বাহনকারিণী পুত্রবধূকে ইঙ্গিত করিয়া কাছে আনিয়া তাহার মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; খোকাকে কাছে আনাইয়া তাহাকে ক্ষণকাল আপনার শীর্ণ বক্ষসংলগ্ন রাখিলেন; অক্ষয়ের দিকে আকুল চক্ষে চাহিয়া কর্ত্তাকে ডাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। পাশে থাকিয়া নলিনী মাতার হাতে বাহুতে হাত বুলাইতেছিল, মাতা কাতর চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া তাহার কেশরাশিতে হাত দিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কর্ত্তা সেঘরে প্রবেশ করিয়া অবস্থা দেখিয়া চকিত হইলেন। গৃহিণীর নিকট যাইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"এখন কেমন আছ ?"

গৃহিণী ক্ষীণস্বরে কি যেন বলিতে চাহিলেন ; তাঁহার চক্ষুর ভঙ্গীতে বুঝা গেল যেন বলিলেন—ভাল আছি। কিন্তু তাঁহার চাঞ্চল্য যেন বৃদ্ধি হইল ; কি যেন বলিতে চাহিতেছেন, বলিতে পারিতেছেন না। কর্ত্তা অতি কাতর জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিলেন। তখন গৃহিণী হাত দিয়া আপনার মস্তক দেখাইয়া তাহাতে স্বামীর পদস্পর্শ প্রার্থনা করিলেন। অতি সংক্ষুব্ধচিত্ত স্বামী সতীর বাসনা পূর্ণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। স্বামীর পদস্পর্শে গৃহিণীর নীলিয়মান মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সীমন্তশোভী সিন্দূরবিন্দু যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রমেশচন্দ্র পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছিলেন, গৃহিণী অপরিমেয় স্নেহভরা চক্ষে রমেশের দিকে চাহিয়া তাহার হস্ত গ্রহণ করিলেন, এবং নলিনীর থর কম্পমান যুগলহস্ত অপর হস্তে ধরিয়া উভয়ের হাত একত্র করিয়া গভীর মর্ম্মস্পর্শী কাতর প্রার্থনা সূচক দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিলেন। মাতার সেই অন্তিম প্রার্থনায় পিতা কি উত্তর করেন দেখিবার জন্য পুত্র পুত্রবধূ পিতার মুখের দিকে যুগপৎ দৃষ্টি প্রয়োগ করিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই হস্তগ্রন্থি স্পর্শ করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, শেষে মৃদুস্বরে বলিলেন ;—"তাহাই হইবে।"

গৃহিণীর ক্ষীণ মুখে দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলাবৎ হাসির রেখা দেখা দিল। রমেশচন্দ্রের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। নলিনীর বুক কাঁপিয়া উঠিল ;—সেখানে বসিয়া থাকা তাহার অসাধ্য হইল—নীরবে উঠিয়া গিয়া পাশের ঘরে শয্যায় পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

লোকের পূর্ণ হৃদয় যখন আবেগসংক্ষুব্ধ হয়, তখন চিত্তের অজ্ঞাতসারে নেত্রে অশ্রু দেখা দেয়!

সেই রাত্রিতে চন্দ্রোদয়ের পর গঙ্গাস্রোতভঙ্গের কুলু কুলু ধ্বনি শুনিতে শুনিতে স্বামী, পুত্র, পৌত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, ভাবী জামাতা—সকলের সাক্ষাতে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া সতী ঈশ্বরধামে চলিয়া গেলেন।

* * * *

কালে রমেশচন্দ্রের সঙ্গে নলিনীর বিবাহ হইল; সে আজ প্রায় চারি বৎসরের কথা। খোকা এক বৎসরের হইলে সকলের ফটোগ্রাফ তোলা হয়। সেই ফটোগ্রাফগুলি ফ্রেমে বাঁধিবার সময় রমেশ "মৃণালিনী"র সেই অঙ্কপাতযুক্ত দুইখানি পাতা ছাঁটিয়া কাটিয়া যোড়া দিয়া অতি উৎকৃষ্ট বিলাতি-ফ্রেমে বাঁধাইয়া নিজের শয্যাপার্শ্বে দেয়ালে খাটাইয়া রাখিয়াছেন।

১৮।১২।১০—১৮।১৩।১——

২৪৪।১১।৬—২৪৪।১১।৭——!

সে দিকে দৃষ্টি পড়িলেই দুজনের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠে!

পরিশিষ্ট

রমেশচন্দ্র অঙ্কপাত-কাহিনী বর্ণনা শেষ করিলেন। কিন্তু সেঘরে নলিনীসুন্দরীর আশু প্রবেশের সম্ভাবনা কম দেখিয়া দুই বন্ধু পরিশেষে ভিতর বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন।

রাত্রিতে আহারান্তে রমেশচন্দ্র নিজ শয়নকক্ষে টেবিলের নিকট বসিয়া পুস্তকপাঠে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার দুই চক্ষু নিদ্রায় ভারি হইয়া আসিতেছিল। শেষে পুস্তক রাখিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন ;—

"কাজের কি আর শেষ নাই ? রাত যে এগারটা বাজে !"

এমন সময় মৃদু রুণু ঝুণু শব্দে নলিনীসুন্দরী সে ঘরে প্রবেশ করিলেন।

রমেশ। "আগমন হইল কি ? বহু ভাগ্য, রাত্রি যে এখনো প্রভাত হয় নাই !"

নলিনী। "কেন, আজ কি ঐ যে টডন্‌টার না কি পোড়ামুখো সাহেবগুলোর পিণ্ডদান এত শীঘ্রই হইয়া গেল ?"

রমেশ। "আজ কি আর কোন বাজে অঙ্কে মন যায় ? অতুলের কাছে অঙ্ককাহিনী আলোচনা করিতে করিতে আজ সারাটা বিকাল কাটাইয়াছি !"

নলিনী। "তোমার কি একটুকু লজ্জাও হইল না ? সমস্তই বলিয়াছ ? আমার সাক্ষাতেই আরম্ভ !—আজ হইতে ও আয়নাখানা আমি বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিব।—কই সেখানা ?"

রমেশ। "পুস্তকের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবার জন্য অতুল তাহা বৈঠকখানায় লইয়া গিয়াছে।—আয়না বাক্সে বন্ধ করিলেই কি আর লোকের মুখ বন্ধ করিতে পারিবে ?"

নলিনী। "বটে!"

নলিনী সেই টেবিলের পার্শ্বে আর একখানি কেদারায় বসিলেন; রমেশচন্দ্রের সম্মুখে যে পুস্তকখানি ছিল, তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন; ডিবা খুলিয়া একটা পানের খিলি স্বামীর মুখে দিয়া বলিলেন ;—

"তোমার মুখ তো বন্ধ করিলাম। কিন্তু আজ যাঁহার নিকট বলিয়াছ, তাঁহার কৃপায় অঙ্কপাতের কাহিনীটা সংবাদপত্রে না উঠিলে বাঁচি।"

রমেশ। "অতুলকে মানা করিয়া দিব, সংবাদপত্রে যেন বাহির না করে!"

নলিনী। "নৌকা ডুবাইবার কথা তুমি আর পাগলকে মনে করিয়া দিও না!—সে কথা থাক্। ঠাকুরঝিকে কবে আনাইবে ?"

নলিনীসুন্দরী শ্বশুরগৃহে থাকা সময় কুমুদিনীকে "ঠাকুরঝি", আর পিত্রালয় গেলে "বৌ" বলিয়া ডাকিতেন। কুমুদিনীও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রমেশ। "তুমি যেদিন বল।"

নলিনী আপনার নিবিড় কেশরাশি পীবর অংশদেশের উপর দিয়া বক্ষের দিকে আনিয়া ক্ষিপ্রহস্তে বেণীবন্ধন করিতেছিলেন। তাঁহার দ্রুত-সঞ্চালিত গৌর অঙ্গুলিদাম আষাঢ়ের নবীন মেঘবৎ সেই কৃষ্ণ কেশরাশির কোণে কোণে বিদ্যুৎবিভ্রম জন্মাইতেছিল। গ্রীবা বক্র করিয়া বেণীবন্ধন কার্য্যে চক্ষু রাখিয়া নলিনী বলিলেন ;—

"আজ রবিবার, পরশ্ব না তোমাদের কলেজ বন্ধ আছে ?"

রমেশ। "হাঁ।"

নলিনী। "সেই দিনই আনিতে পাঠাও।"

রমেশ। "হাঁ।"

নলিনী। "ঠাকুরঝি গতবার আসিয়া এক রাত্রি মাত্র এখানে ছিল; এবার কিন্তু তা হইতে পারিবে না।"

রমেশ। "না।"

নলিনী। "ঠাকুরঝির ছোট খোকা দিব্য ফর্‌সা হইয়াছে!"

রমেশচন্দ্র নিরুত্তর।

নলিনী। "ছোট থাকিতে ঠাকুরঝি বলিয়াছিল, তত ফর্‌সা হইবে না; কিন্তু এখন কেমন ফুট্‌ফুটে ফর্‌সা হইয়াছে!"

রমেশচন্দ্র নীরব, নিস্পন্দ!

নলিনীসুন্দরীর বেণীবন্ধন শেষ হইল। মুখ তুলিয়া দেখিলেন, রমেশচন্দ্র নিদ্রায় বিভোর! আস্তে আস্তে নলিনী সম্মুখস্থ আলোটী উজ্জ্বলতর করিয়া দিয়া নির্ণিমেষনেত্রে স্বামীর সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুপ্ত মুখের বড় শোভা। মানুষ যখন জাগিয়া থাকে তখন মনের ভাব গোপন রাখিয়া কত হাসে, কত কাঁদে—কত কি করে! কিন্তু ঘুমন্ত মুখে কোন ছল চক্র নাই, অন্তরের প্রকৃত চিত্র মুখে ফুটিয়া উঠে। নলিনীসুন্দরী দেখিলেন, এমুখে অন্তরের অপরিমেয় প্রেমের প্রভা প্রস্ফূরিত হইতেছে। চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। তখন কেদারা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া পশ্চাৎ হইতে স্বামীর দুই স্কন্ধে ধীরে ধীরে নিজের নবনীতকোমল দুই বাহু রাখিয়া নলিনী মনে মনে কহিলেন;—

"প্রাণাধিক, ঘুমাইয়াছ!" পরে মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন;—

"ওগো, জাগো; রাত ভোর হইয়াছে!"

রমেশচন্দ্র জাগিয়া উঠিলেন। তখন যদি কেহ পার্শ্বস্থ সুবৃহৎ মুকুরাভ্যন্তরে দৃষ্টিক্ষেপ করিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত,—পরস্পর গাঢ় সংশ্লিষ্ট যুগলমূর্ত্তি হাসিয়া গলিয়া পড়িতেছে!

এমন সময় দ্বারের কাছে ঝি আসিয়া ডাকিল ;—

"দাদাবাবু, জাগিয়া আছ ?"

রমেশ। "কে ও, ঝি ?"

নলিনীসুন্দরী দরজা খুলিয়া দিলেন। ঝি ঘরে প্রবেশ করিয়া এক থানা বই ও বাঁধান একখানা আয়না দিয়া বলিল ;—

"বৈঠকখানা হইতে দাদাবাবু পাঠাইয়াছেন।"

ঝি চলিয়া গেল। রমেশচন্দ্র আয়নার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিলেন ;—

"ওগো, দেখ, অক্ষয় যেন নীচে কি লিখিয়া দিয়াছে!"

২২১।১০।১১—১৬৩।৫।৩—২৪৫।৬।২

৯৪।১১।৭—১৪৯।১২।৫

২৩২।১১৬—১৩।১৬।৬—৭৭।৫।২॥

নলিনী তাড়াতাড়ি "মৃণালিনী" খুলিলেন ; উভয়ে মিলিয়া অর্থোদ্ধার করিলেন ;—

পৃথিবী স্বর্গ হইয়াছে

ঈশ্বর করুণাময়

তাঁহাকে প্রণাম করি॥

তখন দুই জনে একই মুহূর্ত্তে, এক মন, এক প্রাণে যোড়হস্তে জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন।

গীতি-কবিতা, পরিণয়-কাহিনী প্রভৃতি লিখিয়া ভবানীবাবু যশস্বী হইয়াছেন। তিনি সুলেখক। "সরমার সুখে" ভাষার লীলা-তরঙ্গে, ভাবের চন্দ্রিকা-পুলকে চরিত্রের প্রস্ফুট ফুলদাম নিত্য নর্ত্তনময়। ভবানী বাবুর গুণ, তিনি যেটী দেখেন, সেটী কেমন নিখুঁত করিয়া আঁকিয়া চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দেন।—বঙ্গবাসী।

ভবানীচরণবাবু বঙ্গসাহিত্যে অজ্ঞাতনামা লেখক নহেন। এই উপন্যাসে তাঁহার পূর্ব্ব গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে। উপন্যাস খানি বাঙ্গলা উপন্যাস রাবিশের মধ্যে একখানি রত্নবিশেষ, অনেক দিন এমন ভাল উপন্যাস পাঠ করা যায় নাই। পুস্তকের আখ্যানভাগ যেমন মনোরম, চরিত্রগুলি তেমনি উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত। কুলীন দুহিতার এই মর্ম্মভেদী কাহিনী পাঠ করিতে করিতে অনেক সময় চক্ষুপ্রান্তে অশ্রু সঞ্চিত হয়। পাঠ করিতে করিতে দুঃখের সহিত কৌতূহলের পরিমান বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। গ্রন্থকার এই উপন্যাসে দুইটী বিষয় পরিস্ফুট করিয়াছেন। অনন্ত চরিত্রে দেখাইয়াছেন, পাপ ও দুর্ম্মতি যখন সামাজিক শৃঙ্খলা নষ্ট করে, তখন ইহলোকেই তাহার দণ্ড অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। অভাগিনী সরমার চরিত্রে দেখাইয়াছেন—ইহসংসারে ধর্ম্ম, পুণ্য, পবিত্রতা ও কর্ত্তব্য পরায়ণতা সর্ব্বত্র পুরস্কৃত হয় না। পাঠক পাঠিকাগণ পুস্তকখানি পাঠে আনন্দলাভে বঞ্চিত হইবেন না।

বসুমতী।

"সরমার সুখ" একখানি উৎকৃষ্ট সামাজিক উপন্যাস। অনেকদিন পর্য্যন্ত এরূপ উৎকৃষ্ট উপন্যাস পাঠ আমাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই। গ্রন্থকার নিপুণ চিত্রকর,—তাঁহার চিত্রগুলি সুন্দর অথচ স্বাভাবিক হইয়াছে। স্বার্থান্ধ, বিদ্যা বিনয়াদি বর্জ্জিত বৃথা কুলের গৌরবে গর্ব্বিত পিতা স্নেহ মমতা উপেক্ষা করিয়া কিরূপে পুত্র কন্যাদির বিবাহে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হন, গ্রন্থকার তাহার সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন। বিষকুম্ভপয়োমুখী পাপীয়সীগণ কিরূপে বন্ধুতার ছলে কুলকামিনীগণের সর্ব্বনাশ সাধন করে, "তেলিবৌ"র নিপুণ চিত্রে তাহা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। সতী হিন্দুরমণীগণ মিথ্যা কলঙ্কের ভয়ে কিরূপ ভীত হন, সরমার মৃত্যুতে তাহা সুচিত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সামাজিক ব্যাধির সুচিকিৎসক। "সরমার সুখে" বিধবা বিবাহের কথা আছে, গ্রন্থকার ঘটনাচক্রের সন্নিবেশে অবস্থাবিশেষে বিধবা বিবাহের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন। অথচ বিধবা সরমার বিবাহ হয় নাই—হইলেও বোধহয়

সরমা সুখী হইত না, কেননা সরমার হিন্দুরমণী সুলভ কুসংস্কার সম্পূর্ণ ছিল। "সরমার সুখের" প্রায় সমস্ত চরিত্রগুলি স্বাভাবিক হইয়াছে। সরমার অতি দুঃখের জীবন—তবু সরমা আত্মহত্যার প্রতি বিতৃষ্ণ, আত্মহত্যা যে মহাপাপ!—সামান্য কারণে আত্মহত্যার সংক্রামক দিনে কুন্দনন্দিনী যে কুফল প্রসব করিতেছে, "সরমার সুখ" তাহার কিঞ্চিৎমাত্র গতিরোধ করিতে পারিলেও সমাজের বিশেষ মঙ্গল হইবে।—প্রতিবাসী।

কুলীনকুমারীর দুঃখ অনন্ত। এই অনন্ত দুঃখের চিত্র লইয়া ভবানীবাবু সরমার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়াও সরমার ভাগ্যে সুখ ঘটিল না, ইহা বিধিলিপি ও মর্ম্মান্তিক কাহিনী। উপন্যাস খানি পড়িতে পড়িতে কৌতূহল উদ্দীপ্ত থাকে, সরমার জন্য সমবেদনার অশ্রু আপনি ঝরিয়া পড়ে।—চারুমিহির।

ইহার ভাষা যেমন সরল ও বিশুদ্ধ, চিত্রগুলি সেইরূপ জীবন্ত এবং নীতি ও জনসমাজের পক্ষে কল্যাণকর। গ্রন্থের নায়িকা সরমা অভাগিনী চিরদুঃখিনী কুলীন কন্যা—সকল বিপদ পরীক্ষার মধ্যে আপনার চিত্তকে সংযত ও চরিত্রকে নির্ম্মল রাখিয়া দেবীজীবনের সৌন্দর্য্য দেখাইতে দেখাইতে পরলোক গমন করিয়াছেন; তাঁহার সহোদর নগেন্দ্র ও প্রণয়ী সুরেশচন্দ্রও উন্নত চরিত্রের লোক। পাপচক্রান্ত-কারীর পরিণাম যে কি বিষময় তাহাও এই পুস্তকে সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সুবিজ্ঞ এবং সুদক্ষ লেখক।—বামাবোধিনী।

আমরা ইহাকে একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস বলিতে পারি। আমরা ইহা আগ্রহের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি; ইহার কোন পৃষ্ঠাই পড়িতে ক্লান্তি বোধ হয় না। গ্রন্থকারের ভাষা সরল ও সুরুচি সঙ্গত। তিনি পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে ও তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে জানেন।—প্রবাসী।

উপন্যাস খানি পাঠ করিয়া মোটের উপর প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থকার সহৃদয়, কুলীন কন্যা দিগের দুঃখে তিনি যে ব্যথিতহৃদয় তাহার পরিচয় আমরা তাঁহার রচিত "পরিণয়-কাহিনীতে" পাইয়াছিলাম, এই পুস্তকে সেই চিত্র অধিকতর বিস্তৃত ভাবে এবং উজ্জ্বলতর বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। পাপিষ্ঠেরা নিজের পাপানুষ্ঠান দ্বারাই নিজের সর্ব্বনাশ কেমন করিয়া ডাকিয়া আনে, তাহা অনন্তবাবুর চরিত্রে পরিষ্কাররূপে এবং সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সরমা ও সুরেশের বিবাহ যে হইল না, সরমা যে

মরিয়া গেল, ইহাতে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক—বিশেষতঃ উৎকট সমাজসংস্কারকের দল—বোধ হয় বড়ই ক্ষুণ্ণ হইবেন, কিন্তু আমরা প্রীত হইয়াছি। যেরূপ চরিত্র সমাবেশ, যেরূপ ঘটনা পরম্পরা, তাহাতে সরমার মরিয়া যাওয়াই ঠিক হইয়াছে। অন্যরূপ হইলে গুণগ্রাহী বাঙ্গালী পাঠকেরা হয়ত সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু কাব্য সৌন্দর্য্যের অপচয় হইত।—বঙ্গদর্শন।

ইহা একখানি উৎকৃষ্ট গার্হস্থ উপন্যাস। আমরা ললনাবর্গের পক্ষে এই আখ্যায়িকা খানি বিশেষরূপ হিতকর ও উপযোগী মনে করি।

"সরমার সুখে" ঘটনার সন্নিবেশনৈপুণ্য বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সরমা প্রথমতঃ দাদার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে সম্মত হয় নাই, কিন্তু অবস্থাগুলিকে এমন স্বাভাবিক ভাবে পরিণত করা হইয়াছে যে, শেষে এই লাজশীলা সুকুমারী ললনাকে আমরা এক দুশ্চরিত্রা রমণীর সঙ্গে গৃহের বাহিরে সুদূর পথে চলিয়া যাইতে দেখিয়াও আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। চন্দ্ররশ্মিপাতে যেরূপ গৃহকোণের ক্ষুদ্র পুষ্পটীও অপার্থিব শোভা ধারণ করে, উচ্চনীতি ও কর্ত্তব্য পরায়ণতার জ্যোতিতে সরমাও সেইরূপ আদর্শ চরিত্রে পরিণত হইয়াছে, বালিকা গার্হস্থ সুখ দুঃখের সোপান অতিক্রম করিয়া স্বর্গে পৌঁছিয়াছে, কোন কল্পনার পুষ্পকরথ তাহার জন্য প্রেরিত হয় নাই। অবস্থাতেই মনুষ্য চরিত্রের বিকাশ পাইয়া থাকে। সোণার মানুষ অবস্থায় পড়িয়া মৃৎপিণ্ডের মত অসারত্ব প্রদর্শন করে, কখনও বা একান্ত অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিও অবস্থার সাহায্যে দেবচরিত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। যে অবস্থার পরিবর্ত্তন চরিত্র বিকাশ দেখাইবার পক্ষে এরূপ আবশ্যকীয়, কবি এবং ঔপন্যাসিকের সেই অবস্থার বৈচিত্র্য সংঘটন করিয়া দেখান প্রধান, কিন্তু কঠিন কার্য্য। অনেকে লোমহর্ষণ ঘটনাবলীর অতি সহসা অবতারণা করিয়া আখ্যান বস্তুর স্বাভাবিক পরিণতির মূলে কুঠারাঘাত করেন, কেহ বা এত স্বাভাবিক ভাবে অবস্থার প্রবর্ত্তন করেন যে, পাঠকের কিঞ্চিন্মাত্রও কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় না। কিন্তু "সরমার সুখ" গল্পটীতে অবস্থাগুলি পর পর এরূপ নৈপুণ্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঠকালে কৌতূহল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আমরা এই পুস্তকখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারি নাই। অথচ উপন্যাসখানি ডিটেক্‌টিভ্ গল্পের ন্যায় শুধু আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনার তালিকা নহে। গ্রন্থকার চরিত্র এবং সুনীতির জীবন্ত উদাহরণ দ্বারা পুস্তক খানির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তেলিবৌ এবং অনন্তবাবুর

চক্রান্তজাল অতি দক্ষতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের কপটতার পার্শ্বে বিশ্বাসপরায়ণা সরমার সারল্য আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; বস্তুতঃ চক্রান্তশীল দুষ্টবুদ্ধির ব্যূহের মধ্যে একান্ত বিড়ম্বিত সরমাচিত্র বড় সুন্দর হইয়াছে; আবর্ত্তপীড়িত সুকুমার প্রসূনটির মত কৃপা জাগাইতেছে। লেখক সরমার ব্যথায় পাঠককে এতদূর আর্দ্র করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, পুস্তক খানি কতদূর পাঠ করিলে সরমার জন্য আশঙ্কাপূর্ণ মাতৃকরুণায় হৃদয় ভরপুর হইয়া যায়। পাঠকের মর্ম্মের এই গুঢ়তন্ত্রী স্পর্শ করা সাহিত্যের কৌশলের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। এক একটী অবস্থা দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে আসিয়া এরূপ সমস্যা উৎপাদন করিয়াছে যে, তন্মধ্যে সরমাচরিত্রের অনাবিল সৌন্দর্য্য অব্যাহত রাখা সহজ কার্য্য হয় নাই। প্রথম দিন সরমা সামাজিক হাড়িকাঠে স্বীয় গ্রীবা নিজেই উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল, দাদার অনুরোধে পলাইয়া নিজের উদ্ধার চেষ্টা করে নাই;—এঅংশটী বেশ হইয়াছে, যদি পলাইয়া যাইত, তবে গার্হস্থ্য রমণীর চিত্র কতকটা বিকৃত হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; এবং পলাইয়া আত্ম রক্ষা করাই সে অবস্থায় স্বাভাবিক ছিল। মুমূর্ষ বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহের পূর্ব্বে সরমা সুরেশবাবুকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু লেখক সাবধানতার সহিত সেই পূর্ব্বরাগের আভাসমাত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে রক্ষণশীল সুগৃহস্থগণও খুঁত ধরিতে পারিবেন না; সে স্থলে সুদীর্ঘ "হা হতোস্মি"র অবতারণা করিলে অন্তঃপুরবাসিনী ভীরু বঙ্গীয় কুলবধূর স্বাভাবিক ভাবটী বিপর্য্যয় হইত, অথচ এস্থলে প্রেমবর্ণনার এরূপ সুবিধা সাধারণ লেখকগণ কখনই ছাড়াইতে পারেন না। বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইয়া শেষে সরমা দাদার সঙ্গে পলাইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল,—সে স্থানে চরিত্রের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া ইহা অপেক্ষা স্বাভাবিক অন্য কোন পন্থা কল্পনা করা যায় না। তেলিবৌয়ের কথায় প্রতারিত হইয়া সর্ব্বশেষে সে গৃহত্যাগিনী হইল; এই পলায়ন-ব্যাপারে তাহার নির্ম্মল মূর্ত্তিতে কলঙ্কের ছায়া-মাত্রও স্পর্শ করে নাই, বরং সারল্য এবং বিশ্বাস পরায়ণতার ভাবটী একান্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। লেখক কলিকাতার যোড়াসাঁকো ভবনে সরমার পার্শ্বে অনন্তবাবুকে আনয়ন করেন নাই, ইহা তাঁহার বিশেষ কৌশলের পরিচায়ক। পবিত্র কুসুমরূপিনী বালিকাকে লেখক স্বাভাবিক ঘটনার পর্য্যায়ে সাবধানতার সহিত রক্ষা করিয়াছেন। যেখানে সরমা নৈতিক কিংবা গার্হস্থ্য বিপদের কোন প্রান্তসীমায় উপস্থিত হইয়াছে, সেই স্থানেই গ্রন্থকার স্বাভাবিক অথচ আশাতীত কোন অবস্থার সুর উদ্ভাবন করিয়া বালিকাকে মুক্ত

করিয়াছেন; সরমা তখন মেঘ-নিষ্ক্রান্ত শশীলেখার ন্যায় সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে। সুরেশ এবং সরমার প্রেম রোগশয্যার পবিত্র সেবাব্রত উপলক্ষে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বড় সুখের বিষয়, লেখক চলিত উপন্যাস সমূহের অনুকরণে ললিতলবঙ্গ-লতাশীলন কোমল সমীরণ কিংবা ফুলধনুর সহায় চন্দ্রকিরণের দোহাই দিয়া ইহাদের পূর্ব্বরাগ অভিনয়ের মধ্যে বিলাসের আভাস প্রদান করেন নাই। সুরেশের মাতাকে এই প্রণয়ীদ্বয়ের মধ্যে উপস্থিত করাতে আর একটী সাহিত্যিক নৈপুন্য প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বভাব সংস্কারাধীন নহে, সরমার গুণরাশি মাতার সংস্কারগুলিকে সহজেই পরাস্ত করিয়াছিল, অন্য সময় হইলে সরমার তাহা দেখাইবার সুবিধা হইত না, কিন্তু শঙ্কটাপন্না ভাবে কাতর পুত্রের শয্যার পার্শ্বে সেবাব্রতাশীলার কঠোর পরিচর্য্যা স্নেহময় জননী ভুলিতে পারেন কি? বিবাহের যখন সকল অন্তরায় দূরীভূত হইল, যখন পরিণয় সংঘটিত হইলে আমরা সকলেই আনন্দিত হইতাম, তখন লেখক মহাশয় বজ্রের মত কঠিন চিত্তে আর একটী ঘটনা লইয়া অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সরমাকে আমাদের সকলের অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন বলিয়া এ নিষ্ঠুরতা করিলেন। পরিণয়ান্তে সরমাকে আমরা ভালবাসিতাম—মানুষী বলিয়া। কিন্তু সরমা মরিয়া দেখাইল যে, সে মানুষী নহে, দেবী। সামাজিক দুর্ণামের ছায়াও আর তাহাকে ছুঁইতে পারিল না। বস্তুতঃ উপন্যাসখানির আদ্যন্ত সংযত নৈতিক গণ্ডির মধ্যে সুন্দর ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের সাবধানতা তাঁহার কবিত্বের হানিকারক হয় নাই এবং বিশেষরূপে তদ্বর্দ্ধক হইয়াছে। আজকালকার উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্যিক যুগে এইরূপ পুস্তকের সংখ্যা বেশী দেখিতে চাই।—প্রদীপে

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।

গীতি-কবিতা সম্বন্ধে অভিমত

ইহাতে প্রকৃত কবিত্ব আছে; সে কবিতা পাঠ করিয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাস হয়, নিদ্রিত ভাব জাগিয়া উঠে, স্বদেশ হিতৈষিতা প্রবল হয়। "তুমি কে" নামক কবিতায় বঙ্গরাজকুলাঙ্গার লক্ষণ সেনের সুন্দর চিত্র প্রদান করা হইয়াছে। "যশল্মীরের পতনে" রাজপুতনরনারীর অপূর্ব্ব বীরত্বগাথা দেশহিতৈষিতার জ্বলন্ত স্বার্থত্যাগের কথা পাঠ করিয়া কাহার না প্রাণ উন্নত ভাবে পরিপূর্ণ হয়?—সঞ্জীবনী।

* * * "যশল্মীরের পতন" শীর্ষক কবিতাটী পাঠ করিলে যেন নির্জীব নিস্পন্দ শরীরেও জীবনের সঞ্চার হয়।—ঢাকা প্রকাশ।